পরিণয়ে প্রগতি

শ্রীমতী শৈলসুতা দেবী

দি বেঙ্গল বুক্ এজেন্সী
২নং কলেজ স্কোয়ার, (ইষ্ট)
কলিকাতা।
১৩৫২

From 1 to 10 Forms Printed by—Kishorimohan Mandal, Nava Gouranga Press 104, Amharst Street, and the last 3 forms by A. Chowdhury Phœnix Printing Works 29, Kalidas Sinha Lane, Calcutta.

Published by—R. Chakravartty Mymensingh

মূল্য ১॥• দেড় টাকা।

পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গালী দারিদ্র্যে দুর্ভিক্ষে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে নিপীড়িত। শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলা দেশ আজ অজন্মায় শুষ্ক ও শ্রী-হীন। বাঙ্গালী আজ গৃহহীন অন্নহীন বেকার। অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার যতই শূন্য হইয়া আসিতেছে তাহার হৃদয়ের প্রেম ভাণ্ডার ততই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—অন্নহীন শূন্য উদরে, বলহীন দুর্ব্বল দেহে, বিদ্যাহীন অসার মস্তিষ্কে আজ মরিয়া হইয়া শুধু 'প্রেম'চর্চ্চা করিতেছে। তাহার সেই পরমোৎসাহ পূর্ণ প্রেম চর্চ্চায় যদি কোন ক্ষুদ্রতম বাধাও উপস্থিত হয় তবে সে তাহার তারুণ্যের দোহাই দিয়া, যুগ-প্রগতির দোহাই দিয়া কম্বুকণ্ঠে প্রচার করে—তরুণের বাণীকে আজ উপেক্ষা করিলে চলিবে না,—কাহারও উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া নিজের চলার ছন্দকে কুণ্ঠিত করিতে অন্ততঃ তরুণ কাহাকেও মানিবে না।......

তারুণ্য! তারুণ্য! তারুণ্য! কিসের তারুণ্য! হে তরুণ—বিশ্বের রাজসূয় যজ্ঞে কোন্ মন্ত্র পাঠ করিয়াছ? ঋত্বিক হোতা উদ্গাতা কাহার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ? কয়টা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছ? কয়খানা ডেষ্ট্রয়ার ড্রেড্‌নট্ গঠনের প্রচেষ্টা করিয়াছ? জাতির ধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে কি সাধনা আরম্ভ করিয়াছ এবং সিদ্ধ হইয়াছে? বিশ্বের বন্দরে বন্দরে হে তরুণ, হে অপোগণ্ড, তোমার কয়খানি বাণিজ্যপোত পাল তুলিয়া লক্ষ্মী আহ্বণে যাত্রা করিবার আয়োজন করিয়াছ?

অবমানিত, উৎপীড়িত ক্ষুধাতুর বাঙ্গালীর যুগ-প্রগতি আজ ধর্ম্ম, দেশ-প্রেম, দর্শন বিজ্ঞানের প্রগতি নহে—অবাধ প্রণয় ও পরিণয়ের

প্রগতি। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের দরবারে আসন লাভের আশায় নিরাশ হইয়া বাঙ্গালী আজ পরিণয়-প্রগতিকে আপনার জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছে।

এই পরিণয়-প্রগতির পক্ষে যে সকল বাধা বিদ্যমান, সেগুলি সবলে উন্মোচনের জন্য বাঙ্গালীর আগ্রহ ও চেষ্টার অবধি নাই। প্রথম বাধা—তাহার সনাতন শাশ্বত হিন্দু ধর্ম্ম। সে বাধা দূর করিবার জন্য সে অতিশয় চেষ্টিত। শাস্ত্রানুশাসন আর তাহাকে শাসন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না—বরং আইন ও রাজদণ্ড দ্বারা সেই নবযুগের অভিনব শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় সেই শাস্ত্র-সমুদ্র শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেশাচার তো তিন তুড়িতেই উড়াইয়া দিয়াছে। জাতীয়ত্ব বোধকে বাঙ্গালী কার্য্যতঃ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। প্রগতি-মদ-মত্ত কালাপাহাড় সাজিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জীর্ণ দেউলকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর নিষ্ঠা আজ অবাধ মেলামেশায়, ভদ্রনারী নৃত্যে, সহ-শিক্ষায়, প্রণয় দেবতার অবাধ পূজায়। বাঙ্গালীর নিষ্ঠা আজ স্বীয় প্রেমাস্পদের সহিত স্বৈরাচারী মিলনে। বাঙ্গালীর সৎসাহস আজ এই মিলন পথের বিঘ্ন স্বরূপ ধর্ম্মানুশাসন, লোকাচার ও দেশাচার সমূহের ধ্বংস সাধনে—কামজ প্রেমের নিকট বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনার বলিদানে।

বাঙ্গালী আজ দেবপূজা, শাস্ত্রপূজা, গুরুপূজা, বীরপূজার আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভেদ তুলিয়া দিবার ছলে মানবে মানবে বিভেদের প্রাচীর তুলিয়া আত্মকলহ জাগ্রত করিয়া জাতীয় আত্মহত্যাকে সে আজ মানব-পূজা বলিয়া মনে করিতেছে। দেবতা আজ তাহার নিকট ক্রীড়া পুত্তলিকা, দেবমন্দির তাহার ক্রীড়া প্রাঙ্গনে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যকে সে তাহার জাতীয় কাম-পূজার প্রধান উপচারে পরিণত করিতেছে—তাহার 'প্রতিভাবান্' সাহিত্যিকেরা কাম-পূজা মন্দিরের পুরোহিত সাজিয়া অভিচার মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে; আর ইঁহাদেরই

পুরোধারূপে তাহার নবযুগের নব-ঋষি কাম-বেদের সুক্ত সৃজন করিতেছেন। ইহারা আবার আশ্রম খুলিয়া তরুণ তরুণীগণের মেলা বসাইয়া শান্তির ছদ্মবেশে হিন্দুর অন্তঃপুরকে অশান্তির নিকেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্রতী। বিদ্যামন্দির সহ-শিক্ষা-মন্দিরে পরিণত হইয়া তরুণ তরুণীর অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দান করতঃ অবিদ্যা-মন্দিরে রূপান্তরিত হইতেছে। জন-সেবার মহান্ আদর্শকে বাঙ্গালী তাহার অভিচার সাধনের সহায়ক করিয়া জন-সেবা ক্ষেত্রকে উচ্ছৃঙ্খল তরুণ তরুণীর কাম-পূজা প্রাঙ্গনে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

প্রগতি-পন্থী বাঙ্গালী আজ সমাজ-সেবা, লোক-সেবা, দেশ-সেবা, সাহিত্য সেবার ভড়ং এ অবিবেক ও অবিদ্যার সেবাকে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সেবা মনে করিয়া তাহা আপনাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট নহে—সমগ্র দেশের নরনারীকে এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিতেছে না। প্রগতি-পন্থী বাঙ্গালী আজ এই অবাধ-মিলনে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, এই মিলন-স্রোতের কি পরিণাম হইতেছে 'পরিণয়ে প্রগতি' তাহারই যুগ-ইতিহাস।

শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—ইহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, পদস্থ ও দেশব্যাপী আপামর সাধারণের পরিচিত। আমরা কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া এবং কুত্রাপি বিকৃত না করিয়া ইহাদের ইতিহাস যথাযথ ভাবে বিবৃত করিয়াছি। পবিত্র প্রেম সঞ্চারের ফলে যেখানে পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে তাহারও পবিত্র আলেক্ষ্য চিত্রণ হইয়াছে।

অসবর্ণ আন্তর্জ্জাতিক প্রেম-মূলক বিবাহের (Love marriage) পাত্রপাত্রীগণের প্রতি সাধারণ লোকের যে কলুষিত ধারণা আছে, তাহা যে সর্ব্বত্র সঠিক, তাহা নহে। পরিণয়ে প্রগতির যুগ-ইতিহাস পাঠে সমাজের সেই ভ্রম দূর হইবে—অনেক পাত্র পাত্রীর প্রতি হিন্দু সমাজের ঘৃণা সম্যক-বিদূরিত না হইলেও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

এই যুগ-ইতিহাস রচনায় অনেকের প্রদত্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে (কিম্বদন্তির উপর কোন রচনা করা হয় নাই)। যদি কোন ভুল ত্রুটি লক্ষিত হয় সেজন্য আমরা দুঃখিত। সম্মানের হানিজনক অনেক কথা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জন করিয়াছি—তথাপি আমাদের দুর্ব্বল লেখনীর বর্ণনায় যদি কাহারও প্রাণে কোন আঘাত লাগিয়া থাকে সেজন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি কেহ কোন চরিত্র বর্ণনায় কোন দোষ ত্রুটি উপলব্ধি করেন তবে তাহা জানাইলে আমরা সংশোধন করিব। যে সকল অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাহা দয়া করিয়া যদি কেহ আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দেন, তবে এই সংস্করণেই বা পরবর্ত্তী সংস্করণে মুদ্রিত হইবে।

ভবানীপুর
কলিকাতা

শ্রীশৈলসুতা দেবী



পাত্রপাত্রীগণ

শান্তিদাস (শ্রীহট্ট)+অধ্যাপক হুমায়ূন কবির (ফরিদপুর)
জ্যোৎস্না মিত্র (কলিকাতা)+গোপাল লাল সান্ন্যাল (সম্পাদক বঙ্গবাণী)
সুকুমারী রায় (বগুড়া)+নির্ম্মল চৌধুরী (লিবার্টি)
শান্তিসুধা গুহ (বরিশাল)+বিনয় মুখার্জ্জি (কলিকাতা)
সীতা দেবী (প্রবাসী)+সুধীর চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
ইলা রায় (কলিকাতা)+হিমাংশু গাঙ্গুলী (হাওড়া)
আশালতা সেন (কুমিল্লা)+কাজি নজরুল ইছলাম (বর্দ্ধমান)
অনুপমা ঘোষ (কলিকাতা)+নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (যশোহর)
বীণা চট্টোপাধ্যায় (হুগলি)+মুকুল দে (প্রিন্সিপ্যাল আর্টস্কুল)
উমা দেবী (কৃষ্ণনগর)+সত্যেন মিত্র (নোয়াখালি)
শকুন্তলা চৌধুরী (পাবনা)+রঞ্জিত রায় I. C. S. (বরিশাল)
সুনীতি রায় (বরিশাল)+ডাঃ নরেন্দ্র রায় (বরিশাল)
বিভাবতী দেবী (মুর্শিদাবাদ)+কেলাপ্পন (মাদ্রাজ)
অর্পণা দেবী (ঐ)+নগেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি (কলিকাতা)
অমিয়া রায় (পাবনা)+ভানু ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা)
রাণী নিরুপমা (কলিকাতা)+শিশির সেন (শান্তিনিকেতন)
বিন্দু বিশ্বল (পুরী)+কৃপাসিন্ধু মিশ্র I. C. S. (পুরী)
প্রভাবতী দেবী (হাওড়া)+মকবুল আলি (বর্দ্ধমান)
উষারাণী দেবী (কলিকাতা)+নির্ম্মল রায় চৌধুরী (হালিসহর)
মালতী সেন (কলিকাতা)+নবকৃষ্ণ চৌধুরী (কটক)

এনা দেবী (কলিকাতা)+আর সি রায় (কলিকাতা)
রমলা গুপ্তা (কলিকাতা)+তুলসী গোস্বামী (শ্রীরামপুর)
কৈবর্ত্ত বালিকা (কলিকাতা)+অধ্যাপক সুশীল মৈত্র
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
রাধারাণী দত্ত (কলিকাতা)+নরেন্দ্র দেব (কলিকাতা)
কল্পনা সেন (কলিকাতা)+নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী (হাওড়া)
পারুল লাহিড়ী (বরাহনগর)+সুনীল লাহিড়ী (বরাহনগর)
হাসান আরা আজিজ (বর্দ্ধমান)+কানাইয়া লাল গৌবা (লাহোর)
সুশীলা বাগচি (গিরিডি)+মোটর ড্রাইভার (গিরিডি)
শান্তি নিয়োগী (ময়মনসিংহ)+ডাঃ অমলেশ (ময়মনসিংহ)
কঙ্কাবতী (কলিকাতা)+শিশির ভাদুড়ী (হাওড়া)
মৃণালিনী সিংহ (কলিকাতা)+নির্ম্মল সেন (কলিকাতা)

রাজকুমারী প্রতিভা দেবী } — { জন্ ম্যাণ্ডার (লণ্ডন)
রাজকুমারী সুধীরা দেবী } — { হেনরী ম্যাণ্ডার

অরুণা গাঙ্গুলী (বরিশাল)+আসফ আলি (দিল্লি)
সুধা চট্টোপাধ্যায় (বরিশাল)+আলেকজেণ্ডার বেনোয়া (শান্তিনিকেতন)
ললিতা রায় (ঢাকা)+ম্যাট্‌ল্যাণ্ড I. C. S.
মাতুল কন্যা—অতুল প্রসাদ সেন (ঢাকা)
বন্ধুপত্নী (কলিকাতা)+ডাঃ দয়াল গুহ ঠাকুরতা (বরিশাল)
সুজাতা রায় (ঢাকা)+অধ্যাপক সত্যেন রায় (ঢাকা)
সুকুমারী দত্ত (কলিকাতা)+গোষ্ঠ বিহারী দত্ত (কলিকাতা)
ধৈর্য্যবালা (ময়মনসিংহ)+এস, রায় (ময়মনসিংহ)
পদ্মকুমারী সিংহ (কলিকাতা)—বিরেশ্বর ঘোষ (কলিকাতা)
অমিয় চক্রবর্ত্তী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, লিলিয়ান পালিত প্রভৃতি।



শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র



শ্রীমতী শান্তি দাস

শান্তিদাস + হুমায়ূন কবির

বিদুষী বঙ্গমহিলা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা ঘোষ এম্ এ "রাষ্ট্র আন্দোলন ও নারী আন্দোলন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন —

"দেশের নারীকুলকে যাঁহারা স্বাধীনতা-সমরে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত—এ সংগ্রামে নারী আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না, যতদিন পর্য্যন্ত না সে সামাজিক মুক্তিলাভ করে। আজন্ম যে ব্যক্তি পদে পদে শৃঙ্খলিত, অধীনতাকেই যে গৌরবের সামগ্রী মনে করিয়া হাসিমুখে মানিয়া লইতে শিখিয়াছে, রাষ্ট্রগত অধীনতার কাঁটা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে, ইহা কি মনস্তত্ত্ব হিসাবে সম্ভবপর? ব্যক্তিগতভাবে, সমাজগতভাবে যে আপনাকে পঙ্গু স্বীকার করিয়া সন্তুষ্ট, রাষ্ট্রগত পঙ্গুতাকে বিদূরীত করিবার জন্য সে প্রাণপাত করিবে, ইহা আশা করিতে পারা যায় না। স্বাধীনতা যে সত্যই চায়, সে জীবনের সকল শাখায়ই তাহা দাবী করিবে; যে চায় না, সে কুত্রাপি তাহার অভাব অনুভব করে না।"

বিদুষী ও দূরদর্শিনী মহিলার লিখিত এই সকল কথাই আমরা একজন বঙ্গমহিলার জীবনে প্রতিভাত দেখিতে পাই—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও কর্ম্মশক্তিতে যাঁহাকে বঙ্গ-তরুণীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি করা হইবে না। ইনি হইতেছেন স্বনামধন্যা শ্রীমতী শান্তিদাস ওরফে মাহমুদা শান্তি কবির।

শ্রীমতী শান্তি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং একাগ্রভাবে ও একনিষ্ঠার সহিত রাজনৈতিক কার্য্যাবলীতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—একথা বাংলা দেশে কাহারও অবিদিত নাই। রাজনৈতিক ঘনঘটায় বাংলাদেশের আকাশ যখন আচ্ছন্ন, তখন সেই দুর্য্যোগে শ্রীমতী শান্তিকে সর্ব্বত্র আলোকসঞ্চারী বিদ্যুৎরূপে দেখা যাইত। সেই শান্তি যে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরিবর্ত্তে সমাজ-বিপ্লবের প্রতীকরূপে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-সভায় মুসলমান বরের পাণিপ্রার্থীরূপে দেখা দিলেন, তাহারও কারণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্তা ঘোষের কথিত ঐ প্রতিক্রিয়া। শান্তি যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথ চিনিয়াছেন, তখন সামাজিক জীবনেও যে তিনি এই স্বাধীনতাকেই অর্জ্জন করিবার জন্য সৎসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন তাহাতে আর অশ্চর্য্য কি? এই স্বাধীনতা-কামনা যে সকল বঙ্গ-তরুণীকে সমাজ-বিপ্লবের দুঃসাহসিক পথে টানিয়া লইয়া গিয়া যুগ-প্রগতিকে সহজ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীমতী শান্তি দাসের ব্যক্তিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। তাই তাঁহার কাহিনী লইয়াই আমরা যুগ-প্রগতির ইতিহাস রচনা সুরু করিলাম।

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের অনুকূলে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া প্রচলিত সমাজ-বিধির উপরে প্রচণ্ড আঘাত করেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অতি প্রবল সমাজ-বিপ্লবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে তাঁহার তিরোধানের পরে অর্দ্ধ শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তাঁহার অধ্যুষিত ও তাঁহার বংশধরগণের হস্তান্তরিত বিদ্যাসাগর-বাটীতে বসিয়াই আর একটী

সমাজ-বিপ্লব সূচক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া যাহার গুরুত্ব ও দুঃসাহসিকতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচার অপেক্ষা শতগুণে অধিক। আমরা শ্রীযুক্ত হৃদয়প্রকাশ দাস এম-এ'র কন্যা শ্রীমতী শান্তিদাস এম-এ'র সহিত খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আহম্মদের পুত্র মহম্মদ হুমায়ুন কবিরের পরিণয়ের কথা বলিতেছি। পঙ্গু ও স্থবির জাতির সমাজ-বিপ্লব-প্রচেষ্টার জীবন্ত নিদর্শন, সংস্কারকামীর অপূর্ব্ব সাফল্যোচ্ছ্বাস-কোলাহল-মুখরিত এই বিবাহ যে অন্য কোথাও সংঘটিত না হইয়া পুণ্যস্মৃতি-রঞ্জিত বিদ্যাসাগর-বাটীতেই সংঘটিত হইয়াছে, ইহাকে accidental বা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার বলিয়া মনে না করিয়া বিধাতৃ-নির্দ্দেশিত সংযোজন বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কারণ সনাতন ও শাশ্বত হিন্দুর দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানের কাজটাই প্রগতিশীলা শ্রীমতী শান্তি ও শান্তি-জননী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস সমাধা করিয়াছেন। যুগ-প্রগতির ইতিহাসে নিশ্চয়ই ইঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকল মানুষের জীবনের ধারা একই রকম করিয়া গঠন করেন নাই—সৃষ্টিটা তিনি ছাঁচে ঢালিয়া করেন নাই। কাহাকেও নিঃসম্বল করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন আপনার ক্ষমতায় বাঁচিয়া থাকিবার ও আপনাকে গড়িয়া তুলিবার অনুজ্ঞা মাত্র দিয়া, এবং কাহাকেও বা এমনই আবহাওয়ার মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন যে উন্নত জীবন গঠন জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। এই জন্যই আমরা কাহারও জীবনে দৈবের এবং কাহারও জীবনে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখিতে পাই। শ্রীমতী শান্তি যে উত্তর-জীবনে কার্য্যদ্বারা দেশময় প্রসিদ্ধি অর্জ্জন

করিবেন, এটা তাঁহার জন্ম-সৌভাগ্য হইতেই সূচিত হইয়াছিল। আলোকপ্রাপ্ত সমাজে আলোকোদ্ভাসিত পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা শ্রীযুত হৃদয়প্রকাশ দাসের হৃদয় যে ব্রহ্ম-কৃপার স্বর্গীয় আলোকে চির-উদ্ভাসিত, একথা না জানে কে? তাহার পর তাঁহার মাতা। 'শান্তসাধক' 'ঋষি' কেদারনাথের ব্রহ্ম-কৃপার জ্যোতির্ম্মণ্ডিত গৃহে তাঁহার জন্ম। 'ঋষি' পিতার জ্ঞানগৌরবোজ্জ্বল মহিমার সবটুকুই যে শ্রীযুক্তা অশোকলতা লাভ করিয়াছিলেন, সৌভ্রাত্রের বিশ্বময় প্রকাশ যে পিতার শিক্ষাদীক্ষায় তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল, একথাও আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া ঋষিকন্যাগণের ন্যায় অশোকলতাও যে আপনার কর্ম্মদ্বারা একটা কিছু মহীয়ান্ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় নহে। বস্তুতঃ তিনি করিয়াছেনও তাই। সে যুগের ঋষিকন্যারা যেমন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ সৃষ্টি করিতেন, এযুগের ঋষিকন্যা শ্রীযুক্তা অশোকলতাও তেমনি সাম্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশ্বসৌভ্রাত্রের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সাম্যমন্ত্র সুবিস্তৃত ভাবে যথাস্থানে উদ্ধৃত করিবার বাসনা থাকিলেও এইস্থানে তাঁহার মূল অক্ষরগুলি বা গায়ত্রীটী সংযোজিত করিয়া দিলাম :—

"নামের বিভিন্নতায় বস্তুর প্রভেদ হয় না ; হিন্দু যোগী, মুসলমান ফকির বা খৃষ্টান সাধু যিনিই হৌন, যখন তিনি সত্য ঈশ্বরকে লাভ করেন, তখন জাতিধর্ম্ম হিসাবে কোন ভেদাভেদ থাকে না। সমস্ত মানবজাতি এক অখণ্ড পরিবার। এই নূতন বিধানের মহাধর্ম্ম এবং এই অখণ্ড মানবজাতি রচনায় যদি একবিন্দুও কাজে আসিয়া থাকি, তবে আমার জীবন সার্থক।"

এই মহীয়সী জননীর ভিতরকার অগ্নি 'অখণ্ড মানবজাতি রচনার' জন্য প্রদীপ্ত হইলেও তাঁহাদের প্রথমা কন্যা শ্রীযুক্তা প্রীতিদাস চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। যদিও তিনি আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও নারীপ্রগতির মহান্ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তথাপি 'অখণ্ড মানবজাতি' রচনায় কণামাত্র সাহায্য করিতে উৎসুক মহীয়সী জননীর মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল পথে তিনি পদার্পণ করিলেন না বলিয়া জননী অশোকলতা দেবী নিশ্চয়ই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাইতো শ্রীমতী শান্তি যখন তাঁহার সেই মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিবাহে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি উল্লসিত না হইয়া পারিলেন না। তাইতো বলিতেছিলাম—নিজে আপনার পুরুষকারের পরিচয় দিলেও শ্রীমতী শান্তির জীবনে দৈবও বলবান; আন্তর্জ্জাতিক বিবাহে পিতামাতার তরফ হইতে কোনও বাধা তো তিনি পানই নাই, বরং মাতার সহায়তাই লাভ করিয়াছিলেন। প্রগতির ইতিহাসে আমরা যতগুলি পরিণয় প্রার্থিনী দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে শ্রীমতী শান্তির ন্যায় ভাগ্যবতী আর একটী দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উদারতা ও চিত্তের প্রসারতার জন্য শান্তি-জননীর নাম প্রগতির যুগে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিবে সন্দেহ নাই।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীমতী শান্তির মধ্যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়াছিল। কতকটা পরিমাণে তাঁহার এই প্রতিভা সন্দর্শনে এবং কতকটা উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত গৃহের সাধারণ রীতি অনুযায়ী শান্তির মাতা শান্তিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য সচেষ্ট হ'ন। শান্তিও গৌরবের সহিত বি-এ এবং এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। দেশের কাজে নারীজাতির প্রতি মাহাত্মা গান্ধীর আহ্বানবাণী

তখনও ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। তাই লেখাপড়া বা culture-ই শান্তির মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে ঘটনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে, যাহার অসামান্য ধী-শক্তি ও অপরিসীম বিদ্যাবত্তার কথা অল্পদিনের মধ্যেই লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শান্তির জ্ঞানপিপাসু চিত্ত সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ হুমায়ুন কবির।

শ্রীমতী শান্তি যখন বি-এ পড়িতেন, তখন তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুত সুশীল দে প্রেসিডেন্সী কলেজে মিঃ হুমায়ুন কবিরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই সূত্রে সুশীলবাবুর সহায়তায়ই কবির ও শান্তির মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটে।

শ্রীমান কবির ও শ্রীমতী দাসের মধ্যে এই যে প্রথম পরিচয়, ইহা অবশ্যই করুণাময় ভগবানের পরম শুভেচ্ছার ফল। সংসারে নর নারীর পরস্পরের সহিত পরিচয় অনেক সূত্রে অনেক স্থলেই ঘটে। বাসরগৃহেও অপরিচিত পুরুষ ও অপরিচিতা নারীর পরিচয় ঘটে —সে পরিচয় প্রথম পরিচয় হইলেও পুরুষ ও নারী কেহই অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত দুইটী নর ও নারীর এই যে পরিচয়, ইহা অনন্য—ইহা অসাধারণ। বিদ্বানের সহিত বিদুষীর, কর্ম্মযোগীনীর সহিত জ্ঞানমার্গগামীর এরূপ পরিচয় কচিৎ ঘটিয়া থাকে। একদিনের পরিচয়েই উভয়ে উভয়ের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিলেন, অথচ love at first sight বা চারিচক্ষে মিলন মাত্র প্রেম, ইহা তাহাও নহে। দুইটী উন্নত হৃদয় মধ্যে যে সৌসাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই

যেন এক হইয়া গেল—ঘটকালী বা পূর্ব্বরাগ, negotiation বা প্রণয়-দেবতার পঞ্চশর কাহারও অপেক্ষা রাখিল না। এরূপ না হইলে মিলন! তুচ্ছ আন্তর্জ্জাতিক ভেদবুদ্ধি কি কখনও এরূপ মিলনকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে?

যাহা হোক্ শান্তিদের আত্মীয় শ্রীযুত সুশীল দের মধ্যস্থতায় কবিরের সহিত শান্তির পরিচয় ঘটিয়া গেল। এই পরিচয় ঘটে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবতঃ ইউনিভর্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে এক পুরস্কার বিতরণী সভায়। শান্তি ও কবির উভয়েই উভয়ের পরিচয় পূর্ব্বাহ্নে অবগত ছিলেন; উভয়ের মধ্যে জ্ঞানগত যে সাম্য, তাহাই এই পরিচয়কে নিবিড় করিয়া দিল।

বন্ধু সুশীলের বাড়িতে কবির প্রায়শঃই যাইতেন; তাঁহার সহিত সেখানে আর একদিন শান্তির সাক্ষাৎ হইল। ইহার পরে আরও কয়েক-বার সেখানে শান্তির সহিত সাক্ষাৎকার হইল এবং অতঃপর একদিন কবির শান্তিদের বাটীতে গেলেন।

শান্তির পিতা কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকেন। জননী অশোক-লতাই নবাগত অতিথির অভ্যর্থনা করিলেন। কবিরের চেহারাটাই বিশেষ আকর্ষণের; খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী সুদর্শন যুবকটীর দিকে দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়। কবিরকে দেখিয়া শ্রীযুক্তা অশোকলতার বড়ই ভাল লাগিল। তাহার পরে তিনি যখন শুনিলেন যে কবির মাছ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তিনি তাহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলেন।

ইহার পরে শান্তিদের গৃহে কবির নিয়মিত যাতায়াত সুরু করিলেন। সকালবেলা স্নান করিয়া কবির সেখানে যাইতেন এবং সম্ভবতঃ শান্তিদের পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিতেন।

এই সময়ে হুমায়ুন কবিরের কিছু পরিচয় প্রদান করিয়া লই। কবির খান বাহাদুর আবদুল খয়ের কবিরুদ্দিন আহম্মদের দ্বিতীয় পুত্র।

ইঁহাদের নিবাস ফরিদপুর এবং শান্তি-পরিবারের নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। স্কুল-জীবন হইতেই লেখাপড়ায় তাহার মধ্যে বিশেষ মেধা পরিলক্ষিত হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে ভর্ত্তি হ'ন এবং কৃতিত্বের সহিত আই-এ পাশ করেন এবং বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। কবির যেমন প্রথম স্থান অধিকার করিলেন শান্তিও তেমনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। ইহার পর উভয়ে একসঙ্গে কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম. এ পড়েন। এম. এ পড়িবার সময় দিনগুলি তাঁহাদের ভালই কাটিতেছিল। বন্ধুত্ব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশ্য এই বন্ধুত্বের ফলে তাঁহাদের লেখাপড়ার ব্যাঘাত না হইয়া উন্নতিই সাধিত হইল। কবির প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং শান্তি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কবির ও শান্তির বন্ধুত্ব তখন গোপন ছিল না। তাঁহাদের বি. এ. ও এম-এ পরীক্ষায় এমন ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার, ইহা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যজ্জীবনের ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হইল। ইহার পর কবির ইংলণ্ড যাইতে মনস্থ করিলেন, শান্তিরও ইংলণ্ড যাইবার সাধ ছিল কিন্তু নানা কারণে তাহা আর ঘটিল না।

অতি তরুণ বয়স হইতেই কবির সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন এবং সেই সকল কবিতা প্রবাসী প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র সমূহে প্রকাশিত হইত। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সারল্য হুমায়ুন কবিরের কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুণে তাঁহার কবিতাবলী সহজেই জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। হুমায়ুন কবিরের কাব্য-প্রবাহ খরস্রোতা নহে, মন্থরগতি

অল্প-সংখ্যক কবিতাই তিনি লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার একটী রচনাও নিরর্থক হয় নাই—প্রত্যেকটীই সুধী ও ভাবুক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। রচনার স্বল্পতার জন্য অনেক সময়ে আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই; নতুবা বাংলার আধুনিক কবিগণের মধ্যে হুমায়ুন কবিরের স্থান অনেকেরই উপরে। কবির ইংরেজী কবিতা লিখিয়াও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

১৯২৪ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে কবির যে-সকল প্রেমের কবিতা রচনা করেন, ভাব-মাধুর্য্যে তাহা কাব্যামোদীর চির-সমাদৃত হইয়া রহিবে। তাঁহার একটী কবিতার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না :—

সঙ্গিনী

রজনী ভরিয়া তোমারে হেরিয়া স্বপন গাঁথি
প্রভাতে যখন নয়ন মেলিয়া উঠিনু আজি,
দেখিনু ভুবন ভরিয়া আলোক উঠেছে মাতি
শিশিরসিক্ত ভুবন কিরণ-বসনে সাজি।
সহসা আমার মুগ্ধ নয়নে লাগিল ভালো
নবপল্লবে হরিত-মাধুরী, সোনার-আলো।
তোমার প্রেমের পরশ-মাণিক কেমন করি
অন্ধ আমার আঁখিপল্লব ছোঁয়ালে আসি,
নিমিষে আমার পরাণ উঠিল আলোক ভরি
নিমেষে ভুবন নয়নে আমার উঠিল হাসি।
জীবনের যত ঝরা-ছেঁড়া পাতা শীতের শেষে
বাহিরে আসিল নবীন আলোকে নবীন বেশে।

যে পথে আঁধারে শিহরি উঠেছি একেলা ডরে
সে পথে দেখেছি সাঁঝে আড়ালে মরণ নাচে,
সে পথ ভরিয়া তোমার হাসির কিরণ ঝরে
সে পথের পাশে ঝরে-পড়া ফুল আবার বাঁচে।
মরণ তোমার পরশে উঠিল জীবন ভরি'
তোমারে লভিয়া নির্ভয় চিতে ভাসানু তরি।
সংসার পথে যত কোলাহল সবারি মাঝে
নীরব হৃদয় ভরিয়া শুনিব তোমারি বীণা,
দাঁড়াইব পাশে বিঘ্ন বিপদে সকল কাজে
স্বপনে আমার শয়ন রচিবে মানস-বীণা।
সঙ্গিনী মোর, স্বপ্নের সাথী, কাজের ভাগী
দিবস রজনী জীবনে আমার রহিবে জাগি।

বি-এ পড়িবার সময়ে শান্তির সহিত কবিরের পরিচয় লাভ ঘটে; ইহার পরে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবির যখন "ষ্টেট্ স্কলারসিপ্" লইয়া বিলাত যাত্রায় উদ্যত, ঠিক এই সময় কবির ও শান্তির মধ্যে বিবাহই স্থিরীকৃত হয়।

যাহাহউক সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চশিক্ষার জন্য কবির বিলাত চলিয়া গেলেন, আর ভারতে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বান-বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শ্রীমতী শান্তি কেবল এই আহ্বানে সাড়া দিলেন না—বিপুল কর্ম্মশক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

প্রতিভা বহুমুখী, যে পথে যে ক্ষেত্রেই সে পরিচালিত হোক্ না কেন,

আপনার বিকাশের পথ খুঁজিয়া লইবেই। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় মেধা দ্বারা শান্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনেও সহজেই তিনি বিপুল কর্ম্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া অপরাপর মহিলাকর্ম্মিগণের মধ্যে নেতৃত্বের আসন লাভ করেন।

১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে এলবার্ট হলের মহিলা-সভায় যে নারী-সত্যাগ্রহসমিতি গঠিত হয়, শ্রীমতী শান্তি তাহার সম্পাদিকা নির্ব্বাচিত হ'ন। শান্তি-জননী শ্রীযুক্তা অশোকলতাও এই সমিতির অন্যতম সহ-সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শান্তির কর্ম্মশক্তি ইতিমধ্যেই এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে মহিলা-পরিচালিত সমগ্র আন্দোলনের ভার তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে বঙ্গ-মহিলাগণ কুণ্ঠিত হ'ন নাই। যাহা হউক যোগ্যতার সহিত এই কার্য্যভার পরিচালিত করিয়া ৩০ সনের জুলাই মাসের শেষভাগে শান্তি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। তাঁহার জননী অশোকলতাও কারাবরণ করেন।

শ্রীমতী শান্তির রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীমতী জ্যোৎস্নামিত্রের জীবনীতে এক সঙ্গে সংযোজিত হইল। কেবল ইহা বলিলেই বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে শান্তি ছিলেন বাংলার নারী-পরিচালিত আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ এবং সর্ব্ব কেন্দ্রে সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার অসামান্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কেবল ৩০ সালের আন্দোলন নহে, ১৯৩২ সালের আন্দোলনেও শান্তি এক বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। দুই আন্দোলনেই নারী-শক্তিকে নিয়োজিত করিবার গুরুভার তরুণী শান্তিই বহন করেন।

তিনি তিনবার কারাগমন করেন। মোটের উপরে কবির যতদিন বিলাতে ছিলেন ততদিন শান্তির কর্ম্মশক্তির আর বিরাম ছিল না।

৩২ সনের শেষাংশে কবির বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শান্তি শান্ত সমাহিত ভাব ধারণ করেন। তদবধি তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেন নাই। এজন্য অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা চলে না, কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করার আসল উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমতী শান্তি অপূর্ব্ব সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বহুজনপদচিহ্নাঙ্কিত পথে তাঁহার চলিতে ইচ্ছা থাকিলেও নানা কারণে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বাধীনতা-কামীদিগের প্রকৃতিই এই যে, যাহা দুর্লভ তাহারই উপরে তাঁহাদের সাধনা। চিরন্তন সমাজপ্রথা ভাঙ্গিবার সেই দুঃসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রীমতী দাস আপনাকে অগ্রগামী দলের চক্ষে বরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

হুমায়ুন কবিরকে বিবাহ করিবার 'চির-আকাঙ্খার' পরিতৃপ্তি সাধন করিতে শান্তিকে যে সাধনার পথে যাইতে হইয়াছে, তাহার সহিত বুঝি হরলাভে উমার সাধনার তুলনা করিলে অত্যুক্তি করা হয় না! কবির সুদীর্ঘ চার বৎসর কাল বিলাতে ছিলেন। এই চার বৎসর ধরিয়া তপস্যায় কৃষতনু উমার মত তিনি কেবল বিলাতী মেলের পথ চাহিয়া দিন কাটান নাই। চার বৎসরের প্রথম পড়াশুনায় এবং অবশিষ্ট বৎসর রাজনীতিক কার্য্যবলীর মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বিদুষী নারীর যে কবির ভিন্ন অন্য পাত্র জুটিতনা. এরূপ নহে। বরং চেষ্টা করিলে কবির অপেক্ষাও বিদ্বান্ ও কৃতী স্বামীও জুটীয়া যাইতে পারিত। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সূর্য্যমুখী ফুলের ন্যায় তিনি পরম ধৈর্য্য ও পরম স্থৈর্যের সহিত কবিরেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইজন্যই

শান্তির প্রেমকে নিষ্কাম ও পবিত্র প্রেম বলিয়া আখ্যাত করিতে আমাদের এতটুকু দ্বিধা নাই। গোড়ার দিকটায় অবশ্য তাঁহার ও কবিরের মধ্যে সম্পর্ক ধরিয়া লইয়া উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধে অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিল; কিন্তু একে একে যখন বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তখন লোকে আবার ইহাই বলাবলি করিতে লাগিল যে বুঝি শান্তি বিবাহ করিবেন না—বুঝি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত চিরকুমারীই থাকিবেন।

কিন্তু ১৯৩২ সালের একটী ঘটনায় লোকের মনের এই ভ্রান্ত ধারনা অপসারিত হইল। ঘটনাটী আর কিছুই নহে, কলিকাতা টাউন হলে মহিলা-কংগ্রেসের অধিবেশন। নিখিল-ভারতের বিদুষী ও প্রগতি-প্রাপ্তা মহিলাগণের সম্মিলনে এই কংগ্রেস ভারতের নারী-প্রগতির ইতিহাসে এক স্মরনীয় ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে ও রহিবে। এই কংগ্রেসের অধিবেশন জন্য যাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী শান্তির নাম সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয়। মহিলা কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহারই আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকছিল বলিয়া এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশলা বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, এজন্য কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকেই ইহার জেনারেল সেক্রেটারী বা সাধারণ সম্পাদিকার সম্মানিত পদে বরণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য শান্তি এই পদের মহিমা অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শান্তির কর্ম্মকুশলতায় ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী অনুপমা মিত্র, শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শ্রীমতী শোভারাণী দত্ত, শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার প্রমুখ প্রগতিপ্রাপ্তা মহিলাগণের আনুকূল্যে মহাসমারোহে মহিলা-কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল।

কলিকাতার টাউন হল দেখিতে দেখিতে বিরাট মহিলা-মেলায় পরিণত হইল। সে কি উৎসাহ! কি উদ্দীপনা! ভারতের নানাস্থান হইতে মহিলাগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন, বাংলার মফঃস্বলে মফঃস্বলে মহিলারা স্বামীদের তাড়া লাগাইয়া দিয়াছেন—কলিকাতা মহিলা-কংগ্রেসে লইয়া যাইতে হইবে। রংপুরের এক মোক্তারের স্ত্রী তো স্বামী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও আটমাসের শিশুকে স্বামীর তত্ত্বাবধানে ফেলিয়া রাখিয়া হাতের বালা বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহা লইয়াই কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন! মহিলাগণের সেই বিপুল জনসমাগমের মধ্যে সকল কার্য্যে অগ্রণী শ্রীমতী শান্তি বিদ্যুৎবেগে সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। বিষয় নির্ব্বাচনী-সমিতি গঠিত হইল এবং তাহারও বৈঠক বসিল। মূল বৈঠকে উপস্থাপ্য প্রস্তাবগুলি এই বৈঠকে দাখিল করা হইল। দেখা গেল অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে—

(১) আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ

(২) অসবর্ণ বিবাহ

(৩) বিধবা-বিবাহ

(৪) বিবাহ-বিচ্ছেদ বা ডাইভোর্স্ বা-'বিবি তালাক'

এই চারিটী প্রস্তাব ও উপস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমতী শান্তি দাস, শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রমুখ মহিলাগণ জোরের সহিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা গেল, কিন্তু প্রগতিক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তেমন অনেকে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধেও অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক দ্বন্দ্ব-তর্কের পরে শ্রীমতী শান্তি দাস

ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র প্রভৃতির আ-প্রাণ চেষ্টায়ও প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল না। বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাবটী বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে বাতিল হইলে ও সংশোধক প্রস্তাব (amendment) রূপে খোলা কংগ্রেসে আর একটীবার উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশের ভোটে বাতিল হইয়া যায়। নারী-প্রগতির সীমা-রেখা সেদিন আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া থামিয়া পড়ে—ডাইভোর্স পর্য্যন্ত তো আর অগ্রসর হইতে পারিলই না।

শ্রীমতী শান্তি দাসের চেষ্টায় কলিকাতায় নিখিল-ভারত মহিলা-কংগ্রেসের এই অধিবেশন এবং উহাতে অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রস্তাব পাশ—এই সকল ঘটনায় শান্তি কবিরের ভাবী মিলন সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি কেবল ভিত্তিহীন জনপ্রবাদ মাত্র নহে বলিয়াই লেকের মনে ধারণা জন্মিতে লাগিল। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য ভিন্ন আর কোন কাজ কোন দিন করিতে পারেনা, এইরূপ সীমাবদ্ধ যাঁহাদের ভাবনার গণ্ডী, তাহারা ইহাও বলাবলি করিতে লাগিল যে, শান্তি দাস মুসলমান-বিবাহের সমর্থক জুটাইবার জন্যই এত চক্রান্ত করিতেছেন! অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এইশ্রেণীর নীচমনা দিগের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

মহিলা-কংগ্রেসের অধিবেশনের অনতিকাল পরে দ্বিতীয় সার্ব্বজনীন আইন-অমান্য অন্দোলন। শ্রীমতী শান্তি পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ সহকারেই এই অন্দোলনে যোগ দান করিলেন এবং ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগেই পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহার এইবারকার কারামুক্তির পরেই শুনা গেল —অক্সেফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ডিগ্রী লইয়া হুমায়ূন কবির দেশে প্রাত্যাগমন করিতেছেন এবং প্রত্যাগমনের পরেই শান্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। "মৌচাক" নামক শিশুদের মাসিকে প্রায়শঃ

হুমায়ুন কবিরের গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। এই সময়কার একখণ্ড "মৌচাকে" লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ "অক্সফোর্ডের কথা" নামক হুমায়ুন কবিরের একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শান্তির জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা প্রীতিদাস রচনাটী লাল পেন্সিলে দাগিয়া ঐ সংখ্যা মৌচাকের একটী খণ্ড তাঁহার কতিপয় বান্ধবীর নিকটে পাঠাইয়া দেন এবং সেই সঙ্গে এই মর্ম্মে এক সংক্ষিপ্ত চিঠি দিলেন যে এই হুমায়ুন কবির দেশে ফিরিলেই তাঁহার সহিত শান্তির বিবাহ হইবে।

মিঃ কবির বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি অক্‌স্‌ফোর্ডের একজন বিশিষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে তিনি এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তিনি অক্‌স্‌ফোর্ডের কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী ছাত্র এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। 'মডার্ণ গ্রেটে' প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে থাকিতেই কবির অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন। বিলাত পরিত্যাগের পূর্ব্বে ভারত বিষয়ক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা বিলাতের ও দেশের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

অধ্যয়ন শেষ করতঃ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কবির স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীমতী শান্তি ও শান্তি-জননী অশোকলতা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। "নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া কবির যখন তাঁহার সেই চিরপরিচিত খদ্দরখানি পরিয়াই ষ্টেশনে নামিলেন" তখন শান্তি জননী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন! তাহার পর শান্তিদের

বাড়ীতে যাইয়া কবির যখন শান্তি-জননীর কাছে "তাহার সেই একনিষ্ঠ চির-আকাঙ্খা" জানাইল, তখন শ্রীযুক্তা অশোকলতা তাঁহার দাবী অপূরণ রাখিতে পারিলেন না। অপূরণ রাখিবেনই বা কেন! একেতো কবিরের একানিষ্ঠ সম্বন্ধে অশোকলতার মনে এতটুকু সন্দেহ ছিলনা; তাহার উপরে শান্তি লাভ করিবার এই আকাঙ্খা যে সেই নির্ম্মল চরিত্র যুবকের চির-আকাঙ্খা, ইহাও তাঁহার অজানা ছিল না। এক্ষেত্রে "কেবল মুসলমান বলিয়া তিনি যদি কবিরের নিকট কন্যাদানে অসম্মত হ'ন, তাহা হইলে যে তাঁহার অধর্ম্ম হয়!"

অবশ্য পিতা "শান্তসাধক" "ঋষি" কেদারনাথের মহান্ আদর্শও শ্রীযুক্তা অশোকলতাকে এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। "ঋষি" শব্দে পাঠক সেকেলে নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ-ব্যাস-বশিষ্ঠের কথা মনে করিবেন না! এ "ঋষি" একালের "ঋষি"—আর এই একালের ঋষিরা ভদ্র-নারীনৃত্য, স্বাধীন-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিতা উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যেরই প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন। এক কথায় স্বেচ্ছামত সুখ ও সম্ভোগে পদে পদে বাধা প্রদানকারী হিন্দুর সমাজিক-শৃঙ্খলা ও সংযম ভঙ্গ করিতে যিনিই অগ্রসর, তিনিই ঋষি।

শান্তি-জননীর আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সেটী হইতেছে নর ও নারীর মিলনে আন্তর্জ্জাতিক বিভেদ তুলিয়া দিয়া "এক অখণ্ড মানব জাতি চরনায় একবিন্দু ও কাজে আসা।" এই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তেজ ও দীপ্তি আবশ্যক, কন্যা শান্তির মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে দিয়াই তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। জননীর মহান উদ্দেশ্যের সহিত শান্তির ও যে আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই অশোকলতার স্বপ্ন সফল হইতে চলিল।

চারিদিকে তুমুল বাধা উপস্থিত হইলেও শান্তি ও কবিরের বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তির পিতা নাকি দাবী করিলেন—তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে হইলে হুমায়ূনকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। কিন্তু হুমায়ুনের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ও উন্নতমনা যুবক কখনও ধর্ম্মত্যাগে সম্মত হইতে পারেন না—বিবাহের খাতিরেও নহে। হৃদয়প্রকাশবাবু কিন্তু এতটা ভাবেন নাই। যে-সকল অজশ্রেষ্ঠ হিন্দু কেবলমাত্র যৌন আকর্ষণের উন্মত্ততায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাঁহার অভিজ্ঞতা অন্যান্য ব্রাহ্মভ্রাতাগণের মত ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য ভ্রাতাগণের ন্যায় তিনিও বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্প্রসারণে তরুণগণের অপেক্ষা তরুণীগণের উপরেই ভরসা-যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইস্‌লাম যে সে ধাতুতে গঠিত নহে—মোস্‌লেম যে সহজে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেনা! সে খৃষ্টাণীকে বিবাহ করে, কিন্তু মুসলমান করিয়া লয়। এই খানেই যে ইস্‌লামের বিশেষত্ব!

যেমন কবির, তেমনি শান্তি। কবিরের পিতাও ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে শান্তি মুসলমান ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিতা হোক্। কিন্তু শান্তি ও নাকি তাহাতে সম্মত হ'ন নাই। যৌন-আকর্ষনে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম যুবতীর খৃষ্টান বা ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু তিনিতো সেই শ্রেণীর সাধারণ মেয়ে নহেন।

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গেল। মুসলমান মৌলবীর সমক্ষে ব্রাহ্মবিবাহের অনুষ্ঠানে দুইটী নর নারীকে মিলনসূত্রে গ্রথিত করা হইল। কিন্তু কি ইস্‌লাম, কি ব্রাহ্ম কোন ধর্ম্মের ইহা বোধ হয় তেমন সমর্থন পায় নাই; "আহ্‌লে কেতাবী" বা ঐশ্বরিক পুঁথি সংযুক্ত বলিয়া হিন্দুর কন্যা বিবাহে ইসলাম ধর্ম্মের সমর্থন আছে, কিন্তু মিশ্রিত ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদাবিহীন

ধর্ম বলিয়া ব্রাহ্মকন্যা বিবাহে অধিকাংশ মুসলমানই নাকি সম্মতি দিতে পারেন নাই। অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচলিত বিধিতেও বাধিল। তাই সঠিক্ কোন বিবাহ প্রথানুযায়ী না হইয়া উভয় সমাজের সমাজপতিগণ-- এমনকি বর ও কন্যার পিতার অনুপস্থিতিতে এক যৌগিক প্রথানুযায়ী বর ও কন্যার বন্ধু ও বান্ধবীগণের উপস্থিতিতে বিবাহ হইয়া গেল।

১৯৩২ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতা বাদুড়বাগানস্থ বিদ্যাসাগর-বাটীতে বিবাহের আসর বসিল। এই বিবাহে কাজী হিসাবে খান বাহাদুর আসাদুজ্জমান ও আচার্য্য হিসাবে ডাঃ বি-সি-ঘোষ (ইংরাজ মহিলা বিবাহ করিয়া যিনি নিজেও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন) উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের প্রায় সকল অনুষ্ঠান ব্রাহ্মমতেই পরিচালিত হইল--

"তোমার হৃদয় আমার হোক্"
"আমার হৃদয় তোমার হোক্"

"আমাদের মিলিত হৃদয় ভগবানের হোক" বলিয়া বর ও কন্যা পরস্পরের নিকটে প্রকাশ্যভাবে আত্মনিবেদন করিলেন। যে-কয়েকজন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, বিবাহটা ব্রাহ্মমতেই সমাধা হইল, কিন্তু রেজিষ্টারী ও হইলনা; তখন তাঁহারা "দেন্-মোহর" নামক একশত টাকার একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া মুসলমানী প্রথা বজায় রাখিলেন।

বর বিবাহ-সভায় মোস্লেমের জাতীয় পোষাক পায়জামা, আস্কান পরিয়াই উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম মহিলাদের এই পোষাকে বিতৃষ্ণা ছিল বলিয়াই হোক, কি যে কারণেই হোক, তাঁহারা বরকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া আস্কান ছাড়াইয়া খদ্দরের ধুতি-চাদর পরাইলেন ও

মাল্য-চন্দনাদি ভূষিত করিয়া স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন করিলেন। সঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি প্রভৃতি কিছুই বাদ রহিল না।

এই বিবাহে বর ও কন্যার বহু বন্ধু ও বান্ধবী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না সান্যাল (তখন মিত্র) কে সর্ব্বকার্য্যে বিশেষ অগ্রণী দেখা গিয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের অগ্রদূতী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী-চৌধুরাণী ও উপস্থিত ছিলেন। এই সরলা দেবীই পাঞ্জাবী বিবাহ করিয়া মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার সে আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কারণ স্বামী জীবীত থাকিতেই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মায়াবতীতে গিয়া আশ্রম বাঁধিয়াছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে কলিকাতায় আসিয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র ও তাঁহার সহিত কলিকাতায়ই আছেন; আর কখনও পিতৃগৃহে ফিরিয়া যায় নাই।

দুঃখের বিষয় কলিকাতার কোন সংবাদপত্রই এই বিবাহকে সমর্থন ও প্রশংসা করিবার মত উদারতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই; বরং অধিকাংশ সংবাদপত্রই ইহার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে এবং ইহা লইয়া একটা বিরাট বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। "মহম্মদী" ও "হানাফী" এই দুইটা মোসলেম সংবাদপত্রও এই বিবাহের সমথন করিতে পারে নাই; অন্যদিকে হিন্দুসমাজের মুখপত্র "বসুমতী" ইহার বিরুদ্ধে অনলোদ্গীরণ করিয়াছে, আর "ভোটরঙ্গ" স্বভাবসিদ্ধ প্রখর লেখনী ইহার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছে। সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ কয়েকজন বিদূষী মহিলা এই বিবাহ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখানে মুদ্রিত হইল।

বিবৃতি

বসুমতী ১৬ই আশ্বিন ১৩৩৯

মুসলমানের সহিত হিন্দুর বিবাহে মহিলাদের আপত্তি

কলিকাতা

১লা অক্টোবর ১৯৩২

আমরা কয়েকজন হিন্দুমহিলা হিন্দু জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা শান্তিদাস ও তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিতে ও হিন্দুসমাজের পক্ষে গ্লানিকর শান্তি-হুমায়ুনের বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে তাঁহাদের ৩১ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের গৃহে গত ৩০।৯।৩২ তারিখে গিয়াছিলাম। শান্তিদাস অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। আমারা শ্রীযুক্তা অশোকলতার মর্ম্মার্থ হিন্দু জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে দিলাম,—

অশোকলতা—"আমরা কোন ধর্ম্ম মানি না। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদাভেদ নাই, সমাজের কোন নিয়মকানুন মানিতে বা রক্ষা করিতে আমরা নারাজ; গান্ধী বলিয়াছেন যে,—"হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সবই এক।"

দুঃখের বিষয় বর্ষীয়সী ও উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও, হিন্দু সমাজের রক্তে পরিপুষ্টা হইয়াও তিনি যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হিন্দু-সমাজের প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁহার যে নিতান্ত বুদ্ধি-বৈকল্য ও মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্তা দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ

করিয়াও, আধুনিক বহু শ্রেষ্ঠ মনিষী ও ঋষিতুল্য দেশকর্ম্মীর সংসর্গে আসিয়াও আজ যে হিন্দুসমাজের স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয় তাঁহার বোঝা উচিত ছিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, ইহাতে শান্তিদাসের পিতার কোন সংস্রব ও সহানুভূতি নাই। ইতি

নিবেদিকা—

সরলা দেবী, নলিনীপ্রভা ঘোষ, সান্তকুমারী দেবী, মৃণালিনী দেবী, শোভারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণপ্রভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, বিভারাণী দত্ত, কুললক্ষ্মী ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত অশোকলতা নিজে শ্রীযুক্ত সরলা দেবী প্রমুখ মহিলাগণের উক্ত বিবৃতির প্রতিবাদে এক পাণ্টা বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতি পত্রাকারে ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশিত হয়। এই বিবৃতিতে শান্তি-জননী যে সৎসাহস ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। শান্তি-কবিরের বিবাহ সম্বন্ধে যত বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও মনোজ্ঞ বটে। কেবল শান্তি-কবিরের বিবাহ সম্পর্কেই নহে—বাংলার আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের ইতিহাসেও অশোকলতার এই বিবৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। আমরা ইহার প্রতিলিপি পাঠকগণকে উপহার দিলাম :—

প্রতিবাদ

বঙ্গবাণী সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু—

মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রখানি 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল—কিন্তু এতদিনেও তাহা প্রকাশিত হইল না দেখিয়া উহা আপনার নিকট পাঠাইলাম। আশা করি, আপনি ইহা সত্বর প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—শ্রীঅশোকলতা দাস, কলিকাতা, ৩২ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সন

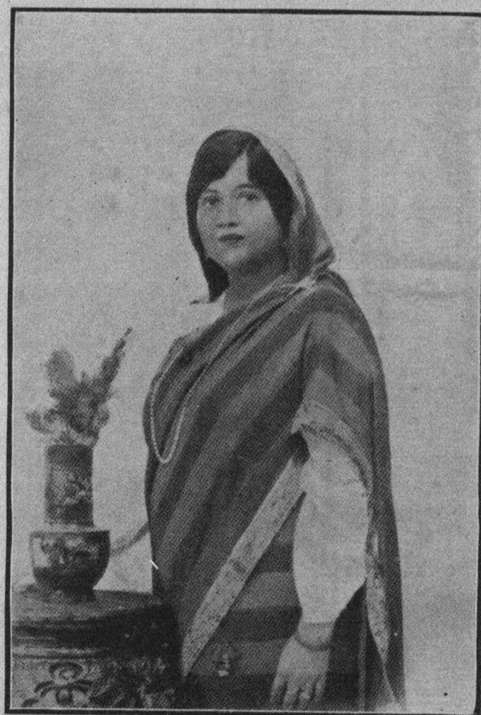
"দৈনিক বসুমতী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, কয়েকজন মহিলা আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া আপনার কাগজে ছাপাইয়াছেন। আমি অনেক দেরীতে এই খবর পাই। আমি তাঁহাদিগকে কি বলিয়াছিলাম, তাঁহারাই বা কি বলিয়াছিলেন সে সকল কথা আমার নিশ্চয় করিয়া এখন মনে নাই এবং সেরূপ প্রতিবাদ করিবার আমার ইচ্ছাও নাই। কিন্তু সাধারণের মনে আমার বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে সেইজন্য কেন মুসলমাকে কন্যা দান করিলাম তাহার একটী বিবৃতি দিলাম :—

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে কবির যখন সকালবেলা স্নানান্তে খদ্দরের কাপড়খানি এবং পাঞ্জাবীটী পরিয়া আমাদের বাড়ী আসিত, আমার বড় ভাল লাগিত। যখন শুনিলাম সে মাছ মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তাহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলাম। তারপর সে রাজবৃত্তি লইয়া সুদূর ইংলণ্ডে দীর্ঘ চারিটী বৎসর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া অসাধারণ সম্মানের সহিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া নিষ্কলঙ্ক চরিত্র লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল এবং একই চিরপরিচিত খদ্দরখানি পরিয়াই ষ্টেশনে নামিল—তারপর বাড়ীতে আসিয়া তার সেই একনিষ্ঠ চির-আকাঙ্ক্ষা জানাইল, তখন কেবল মুসলমান বলিয়া আমি যদি এই নির্ম্মল চরিত্র যুবাকে প্রত্যাখ্যান করি তবে যে আমার অধর্ম্ম হয়। আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব 'শান্তসাধক' 'ঋষি' কেদার নাথ উদার হৃদয়ে সকলকেই গ্রহণ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন "ব্রহ্মভক্ত সকলেই এক জীব।" আমি তাঁহার কন্যা হইয়া এবং সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় নববিধানে শিক্ষিতা দীক্ষিতা হইয়া যদি এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত যুবাকে কেবল মুসলমান বলিয়া কন্যাদানে অসম্মত হই, তবে আমি যে সেই স্বর্গের আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হইব। আরও ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, নামের বিভিন্নতায় বস্তুর প্রভেদ হয় না; যেমন আমরা জল বলি, মুসলমানেরা পানি বলেন, ইংরাজেরা ওয়াটার বলেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত জিনিষটী সকলেরই সমভাবে তৃষ্ণা নিবারণ করে। তেমনই হিন্দু যোগী, মুসলমান ফকির বা খ্রীষ্টান সাধু যিনিই হউন, যখন তিনি সত্য ঈশ্বরকে লাভ করেন, তখন তাঁহার প্রাণ যে ভূমানন্দে পরিপূর্ণ হয়—সেখানে জাতি ধর্ম্ম হিসাবে কোনও ভেদাভেদ থাকে না। ঈশ্বর এক, তাঁর ধর্ম্মও এক, পার্থক্য কেবল বাহিরের আড়ম্বর। বাহ্য আচার ব্যবহারের পাঁচিলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল, দেখিবে সব একাকার। সকলেরই এক ধর্ম্ম এবং সমস্ত মানবজাতি এক অখণ্ড পরিবার। এই নূতন বিধানের মহাধর্ম্ম এবং এই অখণ্ড মানবজাতি রচনায় যদি এক বিন্দুও কাজে আসিয়া থাকি, তবে আমার জীবন সার্থক। শ্রীহরি আশীর্ব্বাদ করুন, তিনিই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন। "ব্রহ্ম কৃপাহিকেবলম্"

—অশোকলতা দাস



শ্রীমতী মৃণালিনী সেন

শান্তি-জননীর এই শেষোক্ত বিবৃতি লইয়া আর এক বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। এই বাদানুবাদের মধ্যে দৈনিক "ভোটরঙ্গে" প্রকাশিত সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। আমরা তাহা মুদ্রিত করিলাম না।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শ্রীযুক্তা অশোকলতার এই বিবৃতি দৈনিক বসুমতীতে প্রেরিত হইলেও প্রকাশিত হয় নাই। বসুমতীর মতে নাকি এই ধরণের চিঠিপত্র সারবস্তাবিহীন ও পাঠক-সমাজের স্বার্থ-সম্পর্ক-বিহীন, তাই তাঁহারা উহা প্রকাশ করেন নাই। আর শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল যে তৎসম্পাদিত বঙ্গবাণীতে ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতে কেবল তাঁহার সৎসাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায় না—উত্তরকালে তিনিও যে স্বাধীন বিবাহের গৌরবমণ্ডিত পথে পদার্পণ করিবেন, তাহাই সূচিত হয়।

হিন্দু-সমাজ এক কারণে এই সকল বিবাহের সমর্থন করে। বিবাহের নামে যেখানে 'লাভ্' বা 'কোর্টশিপ' হইয়া যায়, সেখানে বিবাহ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সে-ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার বিবাহ না দিলে উভয়েরই—বিশেষতঃ এদেশে নায়িকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায়। ঘর পুড়িয়া গেলে ছাইটুকুকেও কাজে লাগাইতে চেষ্টা করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ, তেমনি মেলা-মেশার ফলে ভালবাসা যেখানে অবাধ গতিতে চলিয়াছে, সেখানে বিবাহ দ্বারা উহাকে বৈধতার গণ্ডীতে টানিয়া আনিয়া সর্ব্বনাশা ভাঙন হইতে সমাজকে যতটুকু রক্ষা করা যায়, তাহাই মঙ্গল।

আর একটা কথা—কোর্টশিপ্ বিবাহে কন্যাদানে কাহারও অধিকার আছে কি?

শ্রীযুক্তা অশোকলতার বিবৃতির প্রত্যুত্তরে "বৈশাখী বাংলা"র লেখক শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা যে প্রবন্ধ রচনা করেন, দৈনিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় ঐ প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়। আমরা প্রবন্ধটীর প্রতিলিপি এইখানে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

খাল কাটিয়া কুম্ভীর

খাল কাটিবার আনন্দে মনেই থাকে না যে, সেই খাতমুখে কুম্ভীর প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু কাটা খালে কুমীর ঢোকে। শুধু ঢোকে না, ঢুকিয়া শেষে তাহার করাল বদন ব্যাদন করিয়া যাহারা খননকারী তাহাদেরই পরিশেষে আক্রমণ করে। এমন ঘটনা নিত্যই হইতেছে। অনেক সময় উহা সমাজের চক্ষে পড়ে না, কিন্তু কখনও কখনও পড়ে; সম্প্রতিকার একটী ঘটনায় দেখিতে পাইলাম যে, খালে কুমীর প্রবেশ করিয়াছে। শুধু প্রবেশ করে নাই, রীতিমত মানুষ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কোনও দৈনিক সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, শ্রীযুক্তা শান্তি দাসের সহিত হুমায়ুন কবির মহাশয়ের বিবাহ হইবে। তাহার ২।১ দিন পরেই "দৈনিক বসুমতীতে" এক দীর্ঘ বিবৃতি বাহির হইল। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা উক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবৃতিটী লিখিত হইয়াছে গত ১লা অক্টোবর।

উক্ত আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। কারণ—কথায় আছে—যার সঙ্গে যার মজে মন। অতএব আর কি বলিব। বিশেষতঃ আম, জাম, নারিকেল অপেক্ষা আখরোট, পেস্তা, খুবানীতেই যখন বলকারিতা বেশী, তখন ত বলিবার কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু কহিবার কথা রহিয়াছে ঐ বিবৃত্তি সম্বন্ধে।

"আমরা কোন ধর্ম্ম মানি না। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রভেদ নাই। সমাজের কোন নিয়মকানুন মানিতে বা রক্ষা করিতে আমরা নারাজ। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টান সবই এক।" উক্ত উক্তি করিয়াছেন শান্তিদাসের মাতা। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহাও উল্লেখ করিতেছি যে, "বসুমতী" ছাড়া অন্য কোনও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে উক্ত বিবৃতিটি বাহির হয় নাই! কেন হয় নাই? অতিরিক্ত সত্যনিষ্ঠার জন্য!

"আমরা কোনও ধর্ম্ম মানি না"—এই অশুচি উক্তি ভারতের সুদীর্ঘ দিনের ইতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায় কথনও লিখিত হইয়াছিল কি! **না! না!! না!!!** ইহা শতাব্দীর আত্মহত্যার পরিণাম। যে দিন প্রাচী হইতে পশ্চিমে আমরা মুখ ফিরাইলাম, **য়ুরোপের একান্ত ভোগপ্রবণ ঢংএ** ধাচে দীক্ষিত হইলাম, সেইদিন হইতেই কুম্ভীর আসিবার এই খাল কাটিয়াছি। নব্যতার উন্মাদনায় তাহা বুঝিতে পারি নাই।

যে বিবৃতিটী সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা নিরর্থক ক্ষোভ, ব্যর্থ অভিমান! চলতি কথায় ইহাকে বলে গোড়া কাটিয়া আগায় জল! যেমন বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"দুঃখের বিষয় বর্ষীয়সী ও উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা হইয়াও, হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট হইয়াও তিনি যেরূপ মন্তব্য

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হিন্দুসমাজের প্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁহার যে নিতান্ত বুদ্ধিবৈকল্য ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।" এই বিবৃতাংশ পাঠ করিয়া এই জিজ্ঞাসাই উত্থিত হইতেছে যে, বুদ্ধিবৈকল্য একা কি শ্রীযুক্তা দাসেরই হইয়াছে, না ইহার সহিত অনেকেরই যোগ আছে? যাহারা প্রতীচ্যের ভাব-ভাবিতা, বুদ্ধিবৈকল্য ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি তাঁহাদের প্রত্যেকেরই। এবং এই সিদ্ধান্ত অব্যর্থ।

শ্রীযুক্তা দাস আন্তর্জ্জাতিক বিবাহকে সমর্থন করিয়াছেন, তাই তাঁহার কন্যার সহিত মুসলমান বিবাহের আপত্তি করেন নাই। তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও সংস্কারের বিপরীত কিছু করিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় না। শিক্ষা, সভ্যতা ও স্বাধীনতা নামে এদেশের একাংশ যখন হাবে ভাবে ভঙ্গিমায় বিলাতীয়ানার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনই বুঝা গিয়াছিল, শিক্ষা ও স্বাধীনতার খালে কুম্ভীর প্রবেশ করিয়াছে; মানুষও খাইতেছে। বিগত দিনের ডাইভোর্স মামলায় এবং বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক বিবাহে সেই মানুষ খাওয়া ব্যাপারটা একটু বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা এক রোগের এক একটা উপসর্গ। জাতিভেদ মানিব না, এক সানকিতে ছত্রিশ জাতিতে আহার করিব, আচারনিষ্ঠাকে কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিব, প্রতীক উপাসনাকে বলিব পুতুলপূজা, ইত্যাদি যে ব্যাধির ফল, সেই ব্যাধির অন্যতম উপসর্গ এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ। শেষোক্ত দাম্পত্য সম্বন্ধ যদি দোষের হয়, তবে প্রথমোক্তগণ সমধিক অপরাধী। বরং প্রথমোক্তগণ সমধিক অপরাধী। কারণ তাহাদের কাটাখালে কুমীর প্রবেশ করিয়াছে।

হিন্দুরক্তে জন্মিলেই হিন্দু হওয়া যায় না। হিন্দুত্বের একটা শ্রদ্ধাভূমি

আছে, আছে একটা আচার-নিষ্ঠা। মনে পড়ে গত বৎসর নারী কংগ্রেসে যখন ডাইভোর্শ প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন কি তাহা ঠিক হিন্দুপ্রথায় হইয়াছিল! হিন্দুর চিরাচরিত শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং সংস্কারে উহা কি একান্তই অনুকূল? ব্রত, পার্ব্বণ, পূজা, বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নারী ও পুরুষের অবাধ সম্মিলনের বাধা প্রভৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া হিন্দু হওয়া যায় না। যাহারা পাশ্চাত্যভাব ভাবিতা হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই হিন্দু নহেন!

বিষবৃক্ষের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দিন বৃক্ষ রোপণ করা যায়, সেই দিনই ফল ফলে না। বীজ সেই দিনই রোপণ করিয়াছি, যে দিন প্রতীচ্য জীবন যাপনকে, তাহার স্বৈর আচরণকে উন্নতির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এখন তাহার ফল ফলিতেছে। এখন একটি দুইটি, কালে ঝাকে ঝাকে ফলিবে। ডাইভোর্শ হইয়া গিয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক হইল। ইহার পর পাশ্চাত্য সমাজের যত কিছু অনাচার-কদাচার আছে সবই উপস্থিত হইবে!

এই বিবাহে শ্রীযুক্তা দাসকেই দোষী করিলে চলিবে কেন? যাঁহারা জাতিভেদ না মানিয়া বর্ণধর্ম্মের গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া অবাধ জীবন যাপনের পথে ছুটিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে হিন্দুমুসলমানের প্রভেদের কথা কেন? অস্পৃশ্যতা উঠাইয়া দিয়া হিন্দুকে যাঁহারা এক সানকিতে খাওয়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহাদের আবার এই নূতনতর জাতিভেদ কেন? ভেদ মাত্রেই ভেদ! ব্রাহ্মণ-শুদ্রের ভেদও ভেদ, হিন্দু-মুসলমানের ভেদও ভেদ। শ্রীমতী শান্তিদাস ত বিশ্বের অবারিত পথে যাত্রা করিলেন। অতএব নব্য হিন্দু রিফর্ম্মড কাছে তিনি ত ধন্যবাদার্হ্যা!

একটা কথা বড়ই মর্ম্মান্তিক মনে হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে আছে

"হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট" হইয়াও বাস্তবিক ক্ষোভ হয় মানসিংহের উপর। কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করা যায় না! বিভীষণের অপরাধ অমার্জ্জনীয়! কিন্তু বিভীষণ কে কে এবং কয়টি? কে কে হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? যাঁহারা আইনের—বৈদেশিক আইনের নিকট অবলুণ্ঠিত হইয়া আমি হিন্দু নহি বলিয়া সিভিল ম্যারেজ করিয়া সভ্যভব্য হইতেছেন, তাঁহারা কি হিন্দু-রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? সনাতন প্রতীক উপাসনাকে পুতুল পূজা বলিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিরাকারের সম্পদুপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহারাও কি হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? বর্ণাশ্রমী সমাজের ইষ্টানিষ্টা, আচার ধর্ম্মকে অথর্ব্ব কুসংস্কার বলিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারকে জীবনের পরম কাম্যবস্তু করিলেন, তাঁহারা কোন্ দেশ ও কোন্ সমাজের?

বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যৌবন-বিবাহ, নর-নারীর অবাধ মিলন, ভোজ্য পানীয়ে বাধাবন্ধহীনতা, পাশ্চাত্য বিলাসিতার অনুকরণ এই সমস্তই আমাদের দুগ্রহ। মুসলমানকে বিবাহ করাটার পূর্ব্বকথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত। কেন এমন হইল? ইহাকে সম্ভব করিল কিসে? পুণ্যি পুকুরের ব্রত নিষ্ঠাকে কুসংস্কার বলিয়া লরেটো বেথুনে যখন কন্যা পাঠাইয়াছি, তখনই কি এই কুমীরকে ডাকিয়া আনি নাই! এই যে প্রকাশ্য বিবাহ, ইহা বরং সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ইহার তলে তলে কত যে অনাচার চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সব উন্মার্গচারিতা গোপন আছে। গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সেই সব আচরণ এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ অপেক্ষাও নিন্দার্হ।

"স্ত্রী-শিক্ষা স্বেচ্ছাচারিতা নয়, তাহা তাঁহার বোঝা উচিত ছিল"—বিবৃতিতে এই কথা লিখিত হইয়াছে। স্বীকার করিতেছি—নিশ্চয়ই

বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু শুধু কি একাই শ্রীযুক্তা দাসের? আর কাহারো নহে? যাঁহারা যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা অবাধ মিলনের উৎসাহদাতা? যাহারা নরনারীর স্বাভাবিক পার্থক্যকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কি বুঝিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়? স্বেচ্ছাচারিতা দমন-কল্পে আচার নিষ্ঠার প্রয়োজন, সনাতন সমাজের এই মর্ম্মকথা। আর এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে নব্যতার কাছে কত খোঁটাই না সহিতে হইয়াছে।

কাটা খালে কুমীর প্রবেশ করিয়াছে। এতদিন উহা ডুবিয়া ডুবিয়া মানুষ খাইতেছিল, এইবার প্রকাশ্যভাবে নরহত্যা আরম্ভ করিয়াছে। এখন সেই জন্যই আসিয়াছে, আশঙ্কা। কিন্তু কেবলমাত্র আশঙ্কায় ইহাকে প্রতিরোধ করা যাইবে না। সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করিলেও ফল হইবে না। ইহার নাম ফেরঙ্গ ব্যাধি! আপনার গণ্ডিতে ফিরিয়া আসিলে স্বভক্তিশ্রীতে উদ্ভাসিত হইলে এই সভ্যতার নামে আত্মবিলাসের ব্যাধি নিরাময় হইবে!! স্বভক্তিশ্রী উদ্ভাসিত হয়—স্বধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায়!!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা—

বসুমতী—২২।১০।৩২



"হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট" হইয়াও বাস্তবিক ক্ষোভ হয় মানসিংহের উপর। কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করা যায় না! বিভীষণের অপরাধ অমার্জ্জনীয়! কিন্তু বিভীষণ কে কে এবং কয়টি? কে কে হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? যাঁহারা আইনের—বৈদেশিক আইনের নিকট অবলুণ্ঠিত হইয়া আমি হিন্দু নহি বলিয়া সিভিল ম্যারেজ করিয়া সভ্যভব্য হইতেছেন, তাঁহারা কি হিন্দু-রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? সনাতন প্রতীক উপাসনাকে পুতুল পূজা বলিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে নিরাকারের সম্পদুপাসনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহারাও কি হিন্দুসমাজের রক্তে পরিপুষ্ট নহেন? বর্ণাশ্রমী সমাজের ইষ্টানিষ্টা, আচার ধর্ম্মকে অথর্ব্ব কুসংস্কার বলিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারকে জীবনের পরম কাম্যবস্তু করিলেন, তাঁহারা কোন্ দেশ ও কোন্ সমাজের?

বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। যৌবন-বিবাহ, নর-নারীর অবাধ মিলন, ভোজ্য পানীয়ে বাধাবন্ধহীনতা, পাশ্চাত্য বিলাসিতার অনুকরণ এই সমস্তই আমাদের দুগ্রহ। মুসলমানকে বিবাহ করাটার পূর্ব্বকথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত। কেন এমন হইল? ইহাকে সম্ভব করিল কিসে? পুণ্যি পুকুরের ব্রত নিষ্ঠাকে কুসংস্কার বলিয়া লরেটো বেথুনে যখন কন্যা পাঠাইয়াছি, তখনই কি এই কুমীরকে ডাকিয়া আনি নাই! এই যে প্রকাশ্য বিবাহ, ইহা বরং সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ইহার তলে তলে কত যে অনাচার চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সব উন্মার্গচারিতা গোপন আছে। গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু সেই সব আচরণ এই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ অপেক্ষাও নিন্দার্হ।

"স্ত্রী-শিক্ষা স্বেচ্ছাচারিতা নয়, তাহা তাঁহার বোঝা উচিত ছিল"—বিবৃতিতে এই কথা লিখিত হইয়াছে। স্বীকার করিতেছি—নিশ্চয়ই

বোঝা উচিত ছিল! কিন্তু শুধু কি একাই শ্রীযুক্তা দাসের? আর কাহারো নহে? যাঁহারা যৌবন-বিবাহের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা অবাধ মিলনের উৎসাহদাতা? যাহারা নরনারীর স্বাভাবিক পার্থক্যকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কি বুঝিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়? স্বেচ্ছাচারিতা দমন-কল্পে আচার নিষ্ঠার প্রয়োজন, সনাতন সমাজের এই মর্ম্মকথা। আর এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে নব্যতার কাছে কত খোঁটাই না সহিতে হইয়াছে।

কাটা খালে কুমীর প্রবেশ করিয়াছে। এতদিন উহা ডুবিয়া ডুবিয়া মানুষ খাইতেছিল, এইবার প্রকাশ্যভাবে নরহত্যা আরম্ভ করিয়াছে। এখন সেই জন্যই আসিয়াছে, আশঙ্কা। কিন্তু কেবলমাত্র আশঙ্কায় ইহাকে প্রতিরোধ করা যাইবে না। সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করিলেও ফল হইবে না। ইহার নাম ফেরঙ্গ ব্যাধি! আপনার গণ্ডিতে ফিরিয়া আসিলে স্বভক্তিশ্রীতে উদ্ভাসিত হইলে এই সভ্যতার নামে আত্মবিলাসের ব্যাধি নিরাময় হইবে!! স্বভক্তিশ্রী উদ্ভাসিত হয়—স্বধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধায়!!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা—

বসুমতী—২২।১০।৩২

জ্যোৎস্না মিত্র + গোপাল সান্যাল

মানুষের যতগুলি প্রবৃত্তি আছে তাহার মধ্যে স্বাধীনতা লাভেচ্ছার স্থান সর্ব্বোচ্চ। স্বাধীনতা কামনা মানুষের চিত্তকে যতটা সম্প্রসারিত করে, ততটা আর কিছুতেই করে না। এই স্বাধীনতা-কামনার শক্তি দুর্ণিবার, ইহার শক্তি অনতিক্রমনীয়। ইহা মানুষকে দুর্দ্দম ও দুর্ম্মদ করিয়া তোলে! যুগান্তের বন্ধন ও আজীবনের সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া, আশৈশব পরিচিত স্বজনগণের আহ্বান—শিক্ষার মোহ ও নীতির মায়াজালকে পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখিয়া মানুষকে বিবেক-নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইবার মত শক্তি দান করিতে একমাত্র স্বাধীনতালাভেচ্ছাই সক্ষম। সমাজ ও সংস্কার-বন্ধন যখন মানুষের দেহমনের গতিশীলতাকে পদে পদে বাধা প্রদান করে, তখন সে বন্ধন ডোর ছিন্ন করিয়া, দুর্দ্দম বাধা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা একমাত্র স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা হইতেই মানুষ লাভ করে।

প্রগতিই বল কি অগ্রগতিই বল, স্বাধীনতার বহ্নি হৃদয়মধ্যে প্রজ্জ্বলিত না হইলে কিছুই সম্ভবপর নহে। শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের হৃদয়ে এই স্বাধীনতা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাইতো তাঁহাদের মধ্যে সেই অপূর্ব্ব দীপ্তি দেখা গিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাহা কারাবন্ধনকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যাহা সমাজবন্ধনকে তুচ্ছ করিবার সহায়তা করিয়াছিল। যদি কোন মহেন্দ্রক্ষণে স্বাধীনতার বহ্নি তাঁহাদের

অন্তরমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে আজ আমরা বাংলার এই দেশপ্রেমিক ও দেশপ্রেমিকার বিভিন্ন কর্ম্মশক্তিকে একীভূত মহাশক্তিতে পরিণত দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, না মিলিলেই বা কি ক্ষতি হইত! যুগধর্ম্ম কিন্তু একথা স্বীকার করিবে না। পুরুষ ও নারী পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সহজাত দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যানুযায়ী পৃথক্ ভাবে আপন আপন কর্ম্মপ্রতিভা বিকীরণ করিবে, এ পুরাতন 'থিওরী', বর্ত্তমান যুগানুশাসনে একেবারেই বাতিল। এযুগে পুরুষ ও নারী একই কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বোধে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুগ্ম শক্তিতে পরিণত হইবে, যুগদেবতার ইহাই ইঙ্গিত।

জগতের ইতিহাস দেখ—ইহার প্রতি স্তরে স্তবে কত বীর ও বীরাঙ্গনা জাতি সমাজ ও পিতা মাতাকে উপেক্ষা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যুগ্মশক্তি স্বদেশের বা স্বজাতির কল্যাণ সাধনে উৎসর্গ করিয়াছে। গোপাললাল ও জ্যোৎস্না বাংলার বুকে সেই মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যালের পৈতৃক বাসভূমি পাবনা জিলার অন্তর্গত দৌলতপুরে। দৌলতপুর গ্রামটী খুব বড় না হইলেও এককালে এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবেশী যেরূপ সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি গ্রামের বহুলোক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন।

পাবনা জিলায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য। দৌলতপুরের সান্যাল পরিবার উচ্চশ্রেণীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—সমাজে তাঁহাদের মান-মর্য্যাদা

যথেষ্ট। গোপাললালের অগ্রজগণ সকলেই শিক্ষিত এবং তেমন ধনবান না হইলেও তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অসচ্ছলও নহে।

জ্যোৎস্নার পিতা ছিলেন পোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইঁহাদের নিবাস কলিকাতা।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোপাললাল যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন, তাহার অল্প পরেই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯২১ সালে এই আন্দোলনে মহাত্মার আহ্বানে গোপাললাল কলেজ ছাড়িয়া দেন। বাবু অনন্তলাল মিত্র নামক একটী যুবকও গোপাললালের সঙ্গে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। অনন্তলাল ও গোপাললাল উভয়ে এক সঙ্গে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে এবং বাংলায় বিশেষভাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হইয়া অধিকাংশ ছাত্র এই সময়ে স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিলে তাহাদের অনেকেই আবার স্কুল-কলেজে পুনঃপ্রবেশ করে। গোপাললাল ও অনন্ত কিন্তু তাহা করিলেন না। মেধাবী ছাত্র হইলেও তাঁহারা দেশের কাজেই ব্যাপৃত রহিলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তাঁহারা পরস্পরের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; দেশের কাজে অবতীর্ণ হওয়ার পরে সেই সখ্যতা-বন্ধন ক্রমশঃ নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

এই সময়ে বন্ধুত্বসূত্রে গোপাললাল অনন্ত মিত্রের গৃহে যাতায়াত করিতেন। অনন্তের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী জ্যোৎস্নার বয়স তখন বারো কি তের। সে স্কুলে পড়িত। গৌরাঙ্গী না হইলেও জ্যোৎস্না তখন দেখিতে সুন্দরী ছিল। অগ্রজের বন্ধু গোপালের সহিত প্রথম পরিচয়ের

পর হইতেই জ্যোৎস্না তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, গোপালও তাহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। ফলকথা মিত্র-পরিবারের সকলের সহিতই এই সময়ে সান্যালের বিশেষ প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়।

বিধাতার অনতিক্রম্য বিধানে ১৯২৩ সালে অনন্তলাল পরলোক গমন করেন। অনন্তের মৃত্যুতে মিত্র-পরিবার দুরন্ত শোক-সমুদ্রে ভাসিতে থাকে; প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগে গোপাললালও শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অধিকাংশ শহুরে বন্ধুর ন্যায় মিত্র-পরিবারের এই দুঃসহ বিপদে গোপাললাল দূরে সরিয়া থাকেন নাই—তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় শোকাচ্ছন্ন মিত্র-পরিবারকে সান্ত্বনা দানের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। এইরূপ সহৃদয়তার জন্যই গোপাললাল মিত্র-পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা অনন্তের অভাব কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। ঘটনাসূত্রে গোপাললাল অগ্নিযুগের অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হ'ন। উপেন্দ্রনাথই তাঁহাকে সাংবাদিকতার পথে টানিয়া আনেন এবং স্ব-পরিচালিত সাপ্তাহিক "আত্মশক্তি"র সম্পাদক করিয়া দেন। এই "আত্মশক্তি" অবশ্য ফরোয়ার্ড পাব্লিসিং পরিচালিত "আত্মশক্তি" নহে। ইহার কয়েক বৎসর পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আপ্রাণ চেষ্টায় "ফরওয়ার্ড" প্রকাশিত হয় এবং তাহারও কিছু পরে "ফরোয়ার্ড" অফিস হইতে লুপ্ত "আত্মশক্তি" পত্রিকা নব পর্য্যায়ে প্রবর্ত্তিত হয়। ফরোয়ার্ড সম্পাদনায় উপেন্দ্রনাথ তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনিই তাঁহার স্নেহ-ভাজন গোপাললালকে নবপর্য্যায় আত্মশক্তির সম্পাদক পদে নিযুক্ত

করেন। পরে ফরোয়ার্ড আফিস হইতে দৈনিক "বাঙ্গালার কথা" প্রকাশিত হইলে গোপাললাল উহার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। তদবধি তিনি "বাঙ্গলার কথা" ও "বঙ্গবাণী"র সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং জন-সাধারণ ও কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিয়া ন্যাস্ত দায়িত্বভার বহন করিয়া আসিতেছেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া তাঁহাকে কয়েকবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে—তাহাতে তিনি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হ'ন নাই।

স্বর্গগত জ্যেষ্ঠের পদাঙ্ক অনুসরণে এবং গোপাললালের অনলোদ্‌গীরণকারী প্রবন্ধসমূহ পাঠে শ্রীমতী জ্যোৎস্নার চিত্তেও দেশের কাজে আত্মনিয়োগের বাসনা জাগিয়া উঠে। সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্ধতা মিত্র-পরিবারে স্থান পাইত না; তাই পরিবারস্থ কেহই এ বিষয়ে তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হ'ন নাই—বরং অগ্রজতুল্য সুহৃদ্ গোপাললালের নিকটে উৎসাহ ও উদ্দীপনাই তিনি লাভ করিতেন। ভারতের ভাব-ভগীরথ মহাত্মা গান্ধীর যুগশঙ্খ-নিনাদে যখন সমগ্র দেশ বিপুল কর্ম্ম-প্রবাহে ভাসিয়া গেল, তখনকার সে ভাব-বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে জ্যোৎস্নাও কুণ্ঠিত হইলেন না। যে বাঙ্গালী এতদিন নারীজাতিকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রকে অমানিশার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালীই সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল—তাহাদের সেই সযত্ন-নিরুদ্ধ অর্গলদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাংলার নারী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জ্যোৎস্নার মত শত শত উদ্দীপনাময়ী মহীয়সীর অন্তঃনিস্তৃতঃ জ্যোৎস্নাধারায় বাংলা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য ইহাও সত্য নহে যে বাংলার নারী রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে এযাবত কোন

কাজই করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী ভারতের নারী-শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে খোলাখুলি ভাবে যোগদান করিতে আহ্বান করিবার পূর্ব্বেও বাংলার কোন কোন মহীয়সী নারী প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু দেশপ্রেমে প্রবুদ্ধা অধিকাংশ মহিলাই এযাবতকাল চরকা খর্দ্দর এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচারাদি গঠনমূলক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অসহযোগের সূত্রপাত হইতে ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের আরম্ভ পর্য্যন্ত নারীরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একটা অংশ পরিচালনা করিতেন বটে, কিন্তু এযাবত তাঁহারা থাকিতেন লোকচক্ষুর কতকটা অন্তরালে—নারী আন্দোলন এযাবত ছিল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ব্যাকগ্রাউণ্ড রূপে। সংসারে ও সমাজে পুরুষের সমান অংশীদার হইয়াও নারী এতদিন যেমন ব্যাকগ্রাউণ্ডেরই কাজ করিয়া আসিয়াছেন, গৃহকর্ম্ম ও সন্তান প্রতিপালনাদির মধ্য দিয়া জাতি-গঠনের অতি বড় এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিয়াও নারী যেভাবে আত্মগোপন করিয়া আসিয়াছেন, চিরদিন সেইভাবেই থাকিবেন ইহা আশা করা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিয়াই তাঁহাদের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গৃহকোণস্থ চরকাটী ছাড়িয়া প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া, নারী-সমিতির রুদ্ধদ্বার গৃহ হইতে মুক্তবায়ুসেবিত প্রকাশ্য জনসভায় যোগদান করিয়াই তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল—তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে কেবলমাত্র পুরুষের স্বার্থান্ধতা ও ফক্কিকারীর জন্যই এতদিন তাঁহারা এরূপ নির্ম্মেঘ, নির্ম্মুক্ত আত্মপ্রকাশের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ প্রতিভাশালিনী ও যথার্থ শক্তিমতী তাঁহারা সঙ্গিনীদিগকে এই কথাটাই বারংবার বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রতিভার এরূপ

বিকাশ বাংলা দেশে শ্রীমতী শান্তি দাস, শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র, শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী এবং শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী প্রমুখ মহিয়সী মহিলাগণের মধ্যেই বিশেষ করিয়া দেখা গেল এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশে ও শিক্ষায় অচিরেই মহানগরীর জনসমাকীর্ণ রাজপথ হইতে সুরু করিয়া জনবিরল পল্লীপথ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কুমারী ও তরুণীগণ অবাধে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নারী-প্রগতির জীবন্ত নিদর্শন বাংলায় দেখা গেল।

শ্রীমতী শান্তি ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না প্রমুখ প্রতিভাশালিনী মহিলারা কেবল পুরুষের ফক্কিকারী ধরিয়া ফেলিয়াই নিশ্চিন্ত হ'ন নাই; একটী নূতন সত্যও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে সত্যটী হইতেছে এই যে, নারীকে যাঁহারা স্বাধীনতা সমরে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীকে তাঁহাদের ইচ্ছামত শৃঙ্খলিত করিয়া রাখেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এরূপ শৃঙ্খলিত অবস্থায় আর যাহাই চলুক দেশের কাজে আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করা চলে না। তাই নেতৃস্থানীয়ারা স্বতন্ত্র নারী-সমিতি গঠনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা এমন একটী সমিতি গঠন করিবেন, যাহার সমুদয় কার্য্যভার নারীরাই পরিচালনা করিবেন এবং তাঁহাদের এই সমিতি কোনো কারণেই পুরুষের সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হইবে না। অবশ্য প্রয়োজন হইলে পুরুষদিগকে দেশের কাজে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত থাকিবেন।

শ্রীমতী শান্তি ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না এই সমিতি গঠনের জন্য লাগিয়া গেলেন। ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে এলবার্ট হলে মহিলা-গণের এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। "ভারত ললনা" তখন

কবির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে উদ্দীপনার প্রবাহ বিপুল তরঙ্গেই বহিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এলবার্ট হল প্রগতিসম্পন্না মহিলায় ভরিয়া উঠিল। শ্রীমতী শান্তি দাসকে সম্পাদিকা, শান্তির মহীয়সী জননী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসকে সহ-সভানেত্রী এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য করিয়া এক সমিতি গঠিত হইল। শ্রীমতী অনুপমা মিত্র প্রমুখ অপরাপর তরুণী ও মহিলাগণেরও এই সমিতি গঠনে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। পুরুষগণ তাঁহাদের এই কার্য্যে বাধা প্রদান না করিয়া পিছন হইতে অযাচিতভাবে নানা বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

সমিতি গঠনের পরেই উৎসাহী মহিলাগণ মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশিত কর্ম্মপন্থানুযায়ী কাজ আরম্ভ করেন। সমিতি স্থাপনের কয়েক দিন পরেই সম্পাদিকা শান্তি দাস, জননী অশোকলতা দাস ও অপর দুইজন মহিলার সঙ্গে সত্যাগ্রহে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিবার জন্য যশোহর জিলাস্থ বন্দবিলায় গমন করেন। বন্দবিলায় তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। নারীদের উপস্থিতি পুরুষ কর্ম্মিগণের মধ্যে বিশেষভাবে উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। শ্রীমতী শান্তি এবং শান্তি জননী অশোকলতা দাসের ন্যায় শিক্ষিতা নারীগণও যখন সুদূর পল্লী অঞ্চলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন তখন বন্দবিলার পল্লী-ভগিণীগণও আর গৃহকোণে চুপ করিয়া থাকিলেন না—তাঁহারাও দলে দলে স্বাধীনতা সমরে যোগ দিলেন।

মে মাসের প্রথম দিকে বড়বাজারের পগেয়াপটীতে পিকেটীং আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-সমিতিই এই পিকেটীংএর

উদ্যোক্তা ছিলেন এবং নারী-সেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের পরিচালনায় বহু বঙ্গতরুণী রন্ধন গৃহের মালিন্য, পুত্র-কন্যার ক্রন্দন এবং স্বামীর অযৌক্তিক আধিপত্যের দাবী উপেক্ষা করিয়া সেদিন বড় বাজারের শকটসঙ্কুল জন-সমাকীর্ণ পথে বীরাঙ্গনার ন্যায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া পিকেটিং করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কত শিক্ষিতা, কত কর্ম্মী বঙ্গমহিলাকেই না সেদিন বড়বাজারে উপস্থিত দেখা গিয়াছিল। শ্রীমতী শান্তি এবং সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী ছিলেন এবং শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী, তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শোভারাণী দেবী, শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার, শ্রীমতী অনুপমা মিত্র প্রমুখ অনেক মহিলাই সেদিনকার পিকেটীংএ যোগদান করেন। কেবল বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নহে, বঙ্গের নারী-প্রগতির ইতিহাসেরই সে এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত!

এই সময়ে শ্রীমতী জ্যোৎস্নার পরিচালিত নারী-বাহিনী সহরের উত্তরাঞ্চলের বায়স্কোপগুলিতেও পিকেটীং আরম্ভ করেন এবং সপ্তাহ-কাল বিপুল বিক্রমে বায়স্কোপগৃহে পিকেটীং পরিচালনা করেন। এই সকল কার্য্যে মহিলা কর্ম্মীদের মধ্যে এতটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় যে সমিতির সম্পাদিকাদ্বয়ের মধ্যে একজন বড়বাজারে পুলিশ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া এবং অপরজন কলেজ স্কোয়ারের নিকটে শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে অশ্বারোহী পুলিশের ঘোড়ার খুরে পিষ্ট হইয়াও আন্দোলন পরিত্যাগ করেন নাই। বিপ্লবী ও উন্মার্গগামী ভ্রান্ত যুবকগণ বিকৃত বুদ্ধিবলে যেমন বোমা রিভলভার ইত্যাদিকে স্বরাজ লাভের অন্যতম প্রধান অবলম্বন মনে করিয়াছিলেন, মহিলাদিগকেও তাঁহাদের সেইভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই ভ্রান্ত কর্ম্ম-সূচীর অন্তর্গত



শ্রীমতী শান্তিসুধা গুহ

ছিল আইন অমান্য ও পিকেটিং—মহিলাগণও তাহাই অবলম্বন করিলেন।

কলিকাতার অনুকরণে ঢাকায়ও একটী মহিলা-সমিতি ও নারী-সেনাবাহিনী গঠিত হয় এবং শ্রীমতী আশালতা সেন, শ্রীমতী সরযূবালা গুপ্তা, শ্রীমতী উষাবালা গুহ, শ্রীমতী লীলা নাগ, শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী প্রভৃতি মহিলাগণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, নদীয়া, বগুড়া ও বাংলার অন্যান্য জিলায় নারী-বাহিনী গঠিত হয়। কেবল মৈমনসিংহের মহিলাগণই এই নারী-জাগরণের দিনে নিরস্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিয়া প্রগতি বিষয়ে আপনাদের স্থবিরতার পরিচয় প্রদান করেন। তাহাদের এই আচরণে নিশ্চয়ই বাংলার প্রগতিপ্রাপ্তা নারী-সমাজ অপরিসীম লজ্জা অনুভব করিয়াছিল।

জুলাই মাসের শেষভাগে বড়বাজারে পিকেটীং করিবার সময়ে শ্রীমতী শান্তি গ্রেপ্তার হ'ন। সঙ্গিনী স্বেচ্ছাসেবিকা এবং সঙ্গী স্বেচ্ছাসেবকগণ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীমতী শান্তি গ্রেপ্তার হইলে তদানীন্তন মহিলাকর্ম্মিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠা কর্ম্মী শ্রীমতী জ্যোৎস্না নারী-সমিতির সম্পাদিকা পদে বৃত হ'ন। ইতিপূর্ব্বেই জ্যোৎস্না নারী সেনাবাহিনীর অধিনায়িকা পদে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার উপরে এইবারে আরও গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইল। শ্রীমতী জ্যোৎস্নার ন্যায় কর্ম্মকুশলা তরুণী যে সে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। শ্রীমতী শান্তির গ্রেপ্তারের অল্প কয়েকদিন মাত্র পরে শ্রীমতী জ্যোৎস্না গড়পারের নিকটে এক বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। তিন শতাধিক মহিলা

শ্রীমতী জ্যোৎস্নার পরিচালিত এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। পুলিশ শোভাযাত্রীদের পথরোধ করিল, নায়িকা জ্যোৎস্নার নির্দ্দেশ মত মহিলারা পথের উপরে বসিয়া পড়েন। পুলিশও ধৈর্য্যের সহিত সেখানেই অবস্থান করিয়া শোভাযাত্রিগণের অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। এইভাবে শ্রীমতী জ্যোৎস্না পরিচালিত তিন শতাধিক নারী-সেনানীর সেই বিরাট বাহিনী বেলা দুইটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত পথের উপরে উপবেশন করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে থাকেন। রাত্রি একটার সময় অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না গ্রেপ্তার হইলেন। ইহার পরে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না যখন দেশগতপ্রাণা হইয়া দিনের পর দিন দেশের কাজে নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবে আত্মনিয়োগ করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত সান্যালও তখন লেখনী মুখে সেই মহাভাবেরই প্রচার করিতেছিলেন, যাহা পুরুষকে ভুলায় ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসনের মোহ এবং নারীকে ভুলায় পারিবারিক বন্ধনের বিমোহিনী সম্মোহজাল, আর উভয়কে টানিয়া আনে সেই মহান স্বাধীনতাব পথে—যাহা জ্বলন্ত, যাহা জীবন্ত—যাহা রাষ্ট্র ও সমাজ-বন্ধনের শেষ রশ্মিটুকুও ছিন্ন করিবার জন্য উদগ্র, উন্মার্গ! এক জ্যোৎস্না নহে, গোপাললাল সম্পাদিত দৈনিক বঙ্গবাণী এবং সেই বঙ্গবাণীর সহিত অভিন্ন ও একাত্ম সাপ্তাহিক নবশক্তি দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ নারী-প্রগতির যে অপূর্ব্ব ভাবধারা প্রচার করিয়া আসিয়াছে, তাহা যে লক্ষ লক্ষ জ্যোৎস্নার সম্মুখে স্বাধীনতার আলোক-রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ধরিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—রাজনীতিক উত্তাপে যখন সমগ্র দেশ উত্তপ্ত, তাহার মধ্যে সামাজিক সংস্কার সাধন বা সংস্কার-

সাধনেচ্ছা কোন সূত্রে রাজনীতিক কাজের ভীড় ঠেলিয়া কর্ম্মনিরত অনন্যমনা দেশসেবক ও দেশ-সেবিকার অন্তরে কি ঠাঁই করিয়া লইতে পারে? কিন্তু এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে মূল লক্ষ্য যেখানে স্বাধীনতা সেখানে কর্ম্ম-জগতে যাহাই কেন চলিতে থাকুক্না, ভাব-জগতে রাষ্ট্র ও সমাজকে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার অবকাশ রাখে না। স্বাধীনতার বহ্নি যাঁহার অন্তর মধ্যে ধূমায়মান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অন্তরের সকল গ্লানি, সকল আবর্জ্জনা, সকল সঙ্কীর্ণতা, সকল সম্মোহ শিবনেত্রনিসৃতঃ তেজোবহ্নিতে অতনু কুসুমতনুর ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যাইবেই—সে গ্লানি, সে সঙ্কীর্ণতা, সে সম্মোহ রাজনীতিকই হৌক্ কি সামাজিকই হৌক্।

আর মহাত্মা গান্ধীর সেবারকার আন্দোলন রাজনীতি-ক্ষেত্রে যতটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাপেক্ষা তাহার সামাজিক সাফল্য যে ছিল অধিকতর উজ্জ্বল, একথা কে অস্বীকার করিবে?

ইহা ব্যতিরেকে আরও কিছু ছিল। যুগান্ত সৃজনকারী মহাপুরুষ-গণের প্রবর্ত্তিত ভাব প্রবাহ সকল ভক্তের হৃদয়-সরিতেই প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু সকলে তাহার সকল অংশ সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। মহাপুরুষগণের ভক্ত ও ভক্তিমতীরা, শিষ্য ও শিষ্যার দল নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও মানসিক অবস্থানুসারে গুরুর অজস্র উপদেশাবলীর মধ্যে এক একটী বিশেষ অংশকে আপনার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী ভাব ও কর্ম্মদ্বারা তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার মহামন্ত্র যদি গোপাললালের ন্যায় নির্ভীক্ ও বিদ্রোহী সমাজ-সেবকের কাছে সামাজিক স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবার

কিছুই নাই। রাজনীতি চর্চ্চার অনবসর কর্ম্মস্রোত মধ্যেও গোপাললাল যে কোন মুহূর্ত্তেই সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক সংস্কার ছেদনরূপ মহা-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'ন নাই তাহা তাঁহার সম্পাদিত ও তাঁহার সহিত নিবিড়-ভাবে যুক্ত পত্রিকাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগ্রজ অনন্তলালের জীবিতাবস্থাতেই শ্রীমতী জ্যোৎস্না গোপাললালকে আত্মীয় রূপে বুঝিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনন্তলালের শোচনীয় অকাল-মৃত্যু মিত্র-পরিবারের সহিত শ্রীযুত সান্যালের সান্নিধ্য আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে। ইহার পরে কয়েকটী বৎসর অতিক্রান্ত হইলে কিশোরী জ্যোৎস্না যখন তারুণ্যের সীমারেখা অতিক্রম করেন, তখন গোপাললালের প্রতি তাঁহার সেই স্বজনসুলভ আত্মীয়তার ভাব যে গোপাললাল প্রচারিত ভাবধারার মধ্য দিয়া তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা, বিদূষী ও কর্ম্মীর হৃদয়কে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পবিত্র সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়া অনুরাগে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি!

শ্রীমতী জ্যোৎস্না যেমন গোপাললালের উদ্দীপ্ত লেখনী-সঞ্জাত ভাবপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া পড়িবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, গোপাললালও তেমনি এই সুশীলা সুশিক্ষিতা ও উন্নতহৃদয়া তরুণীর অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি ও একনিষ্ঠ দেশ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে জ্যোৎস্না যখন কারাবরণ করেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহারা পরস্পরকে কর্ম্মজীবনের ন্যায় ধর্ম্মজীবনেও সঙ্গী করিয়া লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন। অনেক রকম বিবাহ-প্রস্তাবের কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু যুগ্‌লেকর ব্যতীত কারাবরণের মুখে দেশ-সেবক ও দেশ-সেবিকার এই যে পরস্পরকে জীবন-সঙ্গী করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ,

বিবাহ-প্রস্তাবের এরূপ অবিমিশ্র পবিত্র নিদর্শন কে কোথায় দেখিয়াছে? এইজন্যই উত্তরকালে ইহারা যখন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'ন, তখন সে বিবাহকে অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক বিবাহ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই মনে করিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুত সান্যাল ও শ্রীমতী মিত্রের এই বিবাহ প্রস্তাবের কথা মিত্র-পরিবারস্থ সকলেই অবগত ছিলেন। উচ্চবংশীয় শিক্ষিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে কন্যা দান করিতে উদার মিত্র-পরিবারের কোন আপত্তি ছিল না। সান্যাল-পরিবারস্থ কেহই সম্ভবতঃ এবিষয়ে পূর্ব্বে কিছু অবগত ছিলেন না। অবশ্য "সমাজতন্ত্রবাদ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা এবং নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক গোপাললাল যে অভিভাবকগণের অভিমতের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবেন, এরূপ মনে করা অনুচিত। দুইটী নরনারীর পরস্পরের হৃদয়ের মিলনই যে প্রকৃত বিবাহ, একথা গোপাললালের পরিচালিত কাগজগুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইতে দেখা গিয়াছে—

এমন কি গত ২৬শে (১৩৩৯) ফাল্গুনের নবশক্তিতে এমন কথাও আলোচিত হইয়াছে যে, "যে-সকল নারী কোর্টশিপ্ করিয়া বিবাহ করেন না, তাঁহারা বেশ্যারই সামিল, কেবলমাত্র তাহাদের একটু লাইসেন্স আছে।" গুরু ও পথ-প্রদর্শক গোপাললাল যখন এই শ্রেণীর ভাবধারার প্রচারক, তখন শ্রীমতী জ্যোৎস্নাও অনুরূপ পথেরই পথিক হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

বাঙ্গালীর উপদেশ বর্ষণ অধিকাংশ স্থলেই কেবলমাত্র কাগজ কলমে হইয়া থাকে; গোপাললাল ও জ্যোৎস্না যে বাঙ্গালীর সেই জাতীয় কলঙ্কিত পথে পরিচালিত হ'ন নাই, ইহা নিশ্চয় তাঁহাদের পক্ষে গৌরবের কথা। নবজাগ্রত বাঙ্গালী, সংস্কারকামী বাঙ্গালী, বিপ্লবপ্রয়াসী বাঙ্গালী যে ইঁহাদের লইয়া গৌরব করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি!

শ্রীমতী জ্যোৎস্না যে কেবল দেশের কাজেই পারদর্শিনী ছিলেন তাহা নহে, তিনি গান, বাদ্য, সূচীকর্ম্ম এবং যাবতীয় গৃহস্থালীতে তুল্যরূপ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সূচীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি এমন অভিজ্ঞ যে সূচীচিত্রের একখানি পুস্তক'ও করিয়াছেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই মিঃ সান্যাল তাহা মুদ্রিত করেন।

কেবল কোর্ট্‌শিপ্ বা পূর্ব্বরাগ-সঞ্জাত বিবাহই নহে, "নবশক্তি" নামক সাপ্তাহিক পত্রখানিতে প্রতি সপ্তাহেই যৌবন-বিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, তরুণ-তরুণীদিগের সহ-শিক্ষা ও সহ-চর্চ্চা, একবৎসর বা তদনুরূপ কালের জন্য পরীক্ষামূলক (Experimental) বিবাহ, এমন কি বিবাহ-বন্ধনের অনাবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা হয়। এই সকল আলোচনা যে সব সময়ে সম্পাদকীয় দপ্তর হইতে করা হয়, এরূপ নহে, বরং অধিকাংশ সময়েই হয়তো ঐ সকল প্রবন্ধ বাহিরের লেখকগণের লিখিত—অবশ্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নবশক্তির নিয়মিত লেখক, কিন্তু রচনা যাহারই হউক—প্রবন্ধাবলী যখন পত্রিকায় স্থান পাইতেছে, তখন পত্রিকা-পরিচালকগণই যে উহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, ইহা নিশ্চিত। এক্ষেত্রে পত্রিকায় যখন এই কথা ছাপা হইয়াছে যে, "যে সকল নারী কোর্টশিপ্ করিয়া বিবাহ করেন না, তাঁহারা বেশ্যারই সামিল" তখন কোন দুষ্ট লোক যদি তর্ক তুলিয়া বলে যে, এই কথা প্রকাশে বা মুদ্রণে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাঁহাদের জনক-জননী কোর্টশিপ্ না করিয়াই বিবাহ করিয়াছেন, তাহারা কি?" তাহা হইলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকিতে পারে!

যাহা হউক—১৯৩০ সালে বিবাহ-প্রস্তাব হইয়া রহিল। প্রস্তাবের পরেই জ্যোৎস্না কারাবরণ করিলেন, গোপাললালও অবশ্য ভবানীপুর

পদ্মপুকুর স্কোয়ারে পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হন, কিন্তু সে মাত্র তিনমাসের জন্য—জ্যোৎস্নার ন্যায় দীর্ঘকালের নিমিত্ত নহে। বিবাহের প্রস্তাব হইয়া রহিল, কিন্তু বিবাহ তখনই সম্ভবপর হইল না। গোপাললাল ও জ্যোৎস্না কেহই অবশ্য সেজন্য অধীর হইয়া উঠিলেন না। তাঁহারা উভয়েই দেশকর্ম্মী, ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা দেশের কল্যাণই তাঁহাদের অধিকতর কাম্য। বিশেষতঃ তাঁহারা উভয়ই পরিণত বয়স্ক, যে বয়সে প্রেমের প্রাবল্য নর-নারীকে অতিমাত্রায় চঞ্চল ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে, দুই জনেরই সে বয়স অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত তাঁহারা বিবাহ সংস্কারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখানেও তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বদেশ-প্রেমের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইবে।

ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের অটল বিশ্বাস আছে তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহ বৎসরের পর বৎসর এমন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না। ইঁহারা উভয়েই উদার হিন্দু বলিয়াই পবিত্র প্রেমকে তাঁহারা জ্যোতিঃমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

১৯৩১ সালের প্রথমভাগে জ্যোৎস্না জেল হইতে বাহির হইলেন। জ্যোৎস্নার কারামুক্তির পরেই বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাঁহাদের বিবাহ ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে জ্যোৎস্নার সর্ব্বাগ্রজ পরলোক গমন করেন। এই মৃত্যুতে জ্যোৎস্না, তাঁহার মাতা এবং ভগ্নী কেবল দারুণ শোকে মুস্‌ড়াইয়া পড়িলেন না—বংশ-দুলালের এই মৃত্যু মিত্র-পরিবারকে অভিভাবকহীন করিয়া দিল।

বিবাহের সকল আয়োজনও সাময়িক ভাবে বন্ধ হইয়া গেল।

তাড়াতাড়ি বিবাহের জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন না। শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ১৯৩২ সালে নভেম্বর মাসে তাঁহাদের শুভ পরিণয় হইয়া গেল।

মদন মিত্র লেনের এক ভাড়াটে বাড়ীতে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কুমারী সুষমা মিত্রের নামে বর ও কন্যা উভয় পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ চিঠি প্রচার হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ হিন্দু মতেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। স্ত্রী-আচার গুলির অনেকটাই হয় নাই, কেবল পাবনার একটী প্রথা প্রতিপালিত হইয়াছিল। কন্যাপক্ষীয় মহিলাগণ একগাছি সূতার দ্বারা বরের কান বাঁধিয়া বলিয়াছিলেন—

"কড়ি দিয়া কেন্‌লাম
দড়ি দিয়া বাঁধ্‌লাম
হাতে দিলাম মাকু
একবার ভ্যা করত বাপু।"

বরের ভ্রাতা বা স্বজনবর্গ কেহ উপস্থিত না থাকিলেও সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বন্ধুগণ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী প্রমুখ স্বরাজ নেতৃবৃন্দ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ প্রায় দুইশত লোক এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত অনেকেই উল্লাসের সহিত বিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন। বর ও কন্যা মাল্যচন্দনাদি ভূষিত অবস্থায় অভ্যাগত-বৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

Liberty, বঙ্গবাণী ও আনন্দবাজার পত্রিকা বিবাহের সমর্থক ছিলেন; কিন্তু Amritabazar, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, নায়ক, ভগ্নদূত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রায় অন্যান্য সকল পত্রিকাই বিবাহের

প্রতিকূলে ছিলেন। শ্রীযুত সান্যালের কোন বন্ধু প্রদত্ত এই বিবাহের একখানি মুদ্রিত প্রীতি-উপহার আমাদের হস্তগত হইয়াছে। অবশ্য 'বন্ধু'টী বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই; নানাপ্রকার উল্লাস প্রকাশ করিলেও স্থানে স্থানে শ্লেষ প্রকাশ করিয়া দুই অকৃত্রিম দেশকর্ম্মীর এই পবিত্র বিবাহের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রীতি উপহারখানির প্রতিলিপি উদ্ধৃত না করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানিয়া দিতেছি।

আমরাও এই নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তাঁহারা জয়যুক্ত হউন। হিন্দু সমাজ অসবর্ণ সখ্য-বিবাহ সমর্থন না করিলেও যে স্থলে বিবাহের পূর্ব্বে সখ্য স্থাপিত হয় সেই বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়াই সমাজের পক্ষে এক প্রকার মঙ্গল বলিয়া মনে করে।

সুকুমারী রায়+নির্ম্মল চৌধুরী

অপার সার্কুলার রোডের "লিবার্টি হাউস্"টীর নামকরণ হয়তো "লিবার্টি" পত্রিকা হইতেই হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ বাড়ীটী সত্য সত্যই লিবার্টি বা স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন। এই বাড়ী হইতেই বঙ্গবাণী-সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীযুত গোপাললাল সান্যাল অসবর্ণ স্বাধীন বিবাহের জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন এবং এই বাড়ী হইতেই "লিবার্টী"র সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুত নির্ম্মল চৌধুরী অসবর্ণ বিধবা-বিবাহের সুমহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীযুত নির্ম্মল চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস বগুড়া জিলার পাঁচবিবি নামক গ্রামে। নির্ম্মলের কাকা শ্রীযুত যোগেন্দ্র চৌধুরী এম্ বি ডাক্তার; বগুড়া সহরের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। বগুড়া জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জিলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। এই মহৎ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ম্মল যে 'নবশাখ' শ্রেণীর একটী হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিয়া একটা অসাধারণ কিছু করিয়া ফেলিয়া বংশগৌরব রক্ষা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

শ্রীযুত কুমুদবন্ধু রায়ও পাঁচবিবিরই জমিদার; চৌধুরীদের বাড়ীর পাশেই তাঁহার বাড়ী। দুইটী বৃহৎ পরিবার পল্লীগ্রামে পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বকোলাহল থাকা স্বাভাবিক, এই দুইটী পরিবারের মধ্যে তাহার অভাব দেখা যায়। রায় ও চৌধুরী উভয় পরিবারের

কাহারও মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না বলিয়া দুইটী পরিবারে নির্ব্বিরোধ সৌহার্দ্দ্য বিদ্যমান। সে সৌহার্দ্দ্য এতদূর নিবিড় যে বাহির হইতে লোকে ইহাদের দুইটী বিভিন্ন বংশসম্ভূত বলিয়াই ধারণা করিতে পারে না।

উভয় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেও ঘনিষ্ট মেলামেশা ও আত্মীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কুমুদবাবুর স্ত্রী নির্ম্মলকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; নির্ম্মলের মাতাও কুমুদবাবুর কন্যা সুকুমারীকে আপনার গর্ভজাত কন্যা অপেক্ষা কম স্নেহের চ'ক্ষে দেখিতেন না। সুকুমারী নির্ম্মলকে নির্ম্মলদা বলিয়া ডাকিত, নির্ম্মল তাহার সহিত স্নেহময় ব্যবহার করিতেন। ইহাদের দুইজনকে একত্রে খেলা করিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া সুকুমারীর মাতা নির্ম্মলের মাতাকে বলিতেন—"দুইটীতে বিয়ে হ'লে কিন্তু বেশ মানায়!"

সুকুমারীর বয়স বাড়িয়া উঠিল। কুমুদবাবু মেয়ের বিবাহের চেষ্টা দেখিলেন। টাকা-পয়সার অপ্রতুল নাই; নিজে দেখিয়া শুনিয়া যত আবশ্যক হয় অর্থব্যয় করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক পাত্র দেখিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগরের এক ধনী-গৃহে সচ্চরিত্র শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে তিনি সুকুমারীর বিবাহ দিলেন। বিবাহে বেশ ঘটা হইয়াছিল; সপরিবারে এই বিবাহে যোগদানের জন্য বগুড়ায় যোগেন্দ্রবাবুর কাছেও চিঠি গিয়াছিল।

কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম মানুষ কি করিয়া ঠেকাইবে? বিধাতা বুঝি সুকুমারীকে নির্ম্মলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—দৈব যেখানে বাড়ীর কাছে সুকুমারীর বর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, পুরুষকারের সহায়তায় সেখানে দূর হইতে পাত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেই কি সে তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইয়া থাকিতে পারে?

বিবাহের অল্প পরেই সুকুমারীর পতি-বিয়োগ হইল। আদরিণী কন্যা বিধবা হওয়ায় কুমুদবাবু ও তাঁহার স্ত্রী হৃদয়ে যে আঘাত পাইলেন, তাহার বুঝি সান্ত্বনা নাই। নির্ম্মলের মাতাও তাঁহাদের এই বেদনা বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন—শুনা যায় নির্ম্মল নিজেও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পতি-বিয়োগের সময় সুকুমারীর বয়স ছিল ষোল কি সতেরো। তখন সবেমাত্র সে স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছে, স্বামীর সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যৌবনের এই বিকাশ-কালে স্বামী যাহার বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করে, তাহার হৃদয়ের দুঃসহ বেদনা বুঝিবার সাধ্য বুঝি এ সংসারে কাহারও নাই। স্বামীকে লইয়া যে সুখের নীড় সে গড়িয়াছিল, যে সুখময়ী ভবিষ্যতের কাল্পনিক চিত্র মনে মনে সে আঁকিয়া লইয়াছিল, এক নিমেষে তাহা ধূলিস্যাৎ হইয়া গেল। এই নিদারুণ শোকে সুকুমারী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পড়িবেই বা না কেন? হৃদয়ের নিভৃততম কোনটুকু পর্য্যন্ত শূন্য করিয়া স্বামীকে সে সবখানি ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিল, বিনিময়ে স্বামীর কাছেও পাইয়াছিল অসীম ভালবাসা, অবিস্মরণীয় প্রেম! প্রথম যৌবনের সে ভালবাসা, সে প্রেম কি জীবনেও ভুলিবার?

যে পরিবারে সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহারা 'নবশাখ' শ্রেণীর হিন্দু হইলেও প্রাচীন জমিদার বংশ। সে পরিবার একটী উদার ও মহৎ পরিবার। যে বংশ-দুলাল পরিবারটীকে কাঁদাইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছে, তাহার শোক যেমন পরিবারস্থ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিল, তেমনি দুর্ভাগিনী সুকুমারীর ভবিষ্যৎ চিন্তায়ও তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যে সুকুমার নারী-জীবন যৌবনোন্মেষেই শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, অপর দিক হইতে তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য

পরিবারস্থ সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, লেখাপড়া লইয়া থাকিলে বধূর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত কতকটা সমাহিত হইয়া আসিবে—পরন্তু জীবন-যাপনে একটা অবলম্বনও সে পাইবে। তাই শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইয়া আসিলে পড়িবার জন্য সুকুমারীকে কলিকাতায় পাঠানো হইল।

সুকুমারীর ভাসুর-পুত্র কলিকাতায় বৈঠকখানা রোডে থাকিয়া ব্যবসা করেন। খুল্লতাত-পত্নীকে তিনি পরম সমাদরে পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুকুমারী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে লাগিল। আত্মীয় জানিয়া নির্ম্মল মাঝে মাঝে তাহার খবর লইত। নির্ম্মলের নিকট পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনদের খবর পাইয়া সে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিত।

ক্রমে ক্রমে সুকুমারী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইল। সুকুমারীর ভাসুর-পুত্র তাহার পুনর্ব্বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু এতদিন সুকুমারী সম্মতিদান করেন নাই। একটী নির্ম্মল ও শুভ্র শুচিতা সুকুমারীকে সর্ব্বদা ঘেরিয়া থাকিত; তাই তাহার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করা সহজসাধ্য ছিলনা। প্রথম স্বামীর স্মৃতি হৃদয় হইতে একটু একটু করিয়া বিস্মৃতিগর্ভে লীন হইলে তেইশ কি চব্বিশ বৎসর বয়সে সুকুমারী নির্ম্মলের সহিত বিবাহিতা হইলেন। পিতামাতা ও খুল্লতাতের অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়া নির্ম্মল যে সৎসাহসের পরিচয় দিলেন, তাহার তুলনা ক্বচিৎ মিলিয়া থাকে।

নির্ম্মলের খুল্লতাত যোগেন্দ্রবাবু বিধবা-বিবাহের সমর্থক এবং পতি-বিরহিণী বিধবার দুঃখ দূর করিতে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট, বিধবার দুঃখে

তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত ; তথাপি তিনি যে কেবল জাতির দোহাই দিয়া এই বিবাহের বিরোধিতা করিয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আরও দুঃখের বিষয় যে, সুকুমারীর পিতা কুমুদবাবু পর্য্যন্ত এই বিবাহে যোগ দেন নাই। তথাকথিত যুগ-ধর্ম্মের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন জানিনা। যে যুগ-প্রগতির দুকূলপ্লাবী তরঙ্গকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবেনা, তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে বহিতে দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়ান ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় কি আছে আমরা জানি না।

জমিদারের আদরিণী কন্যাদের অনেকগুলি নাম থাকে, যাহার যে নাম ধরিয়া ডাকিতে ভাল লাগে সে সেই নামে ডাকে। সুকুমারীর কয়েকটী নাম আছে—তন্মধ্যে 'আভারাণী'ও নাকি অন্যতম নাম।

শান্তিসুধা গুহ + বিনয় মুখার্জ্জি

প্রেমের দেবতা নাকি অন্ধ। এই অন্ধ দেবতাটী যেথানেই তাঁহার পবিত্র পঞ্চশরের স্পর্শ লাগাইয়াছেন সেখানেই নর ও নারী আপনার অবস্থা, সামাজিক সংস্থান ও ভাবী-জীবনের কথা ভুলিয়া গিয়া অন্ধ দেবতার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়াছে। বিশ্ব-সংসারের কোন বাধা তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই জন্যই নর নারীর চিত্তের সম্প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে উদার করিয়া তুলিতে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি তীব্র অনুরাগের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বের জয়ধ্বজা বহন করিবার মত শক্তি তাহাদিগকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে এই প্রেম যতটা সমর্থ ততটা আর কিছুতেই নহে। এই জন্যই সকল যুগের সকল কালের কবি ঋষিগণ মানুষের অন্তঃকরণস্থ উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সকলের শীর্ষ-স্থানে প্রেমের আসন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধা গুহ ও শ্রীমান্ বিনয় ভূষণ মুখার্জ্জি ইহার জলন্ত নিদর্শন। এখানে তাহাদের পবিত্র প্রেমের পরিণয় কাহিনীর একটু বিবরণ দেওয়া হইল।

কুমারী শান্তিসুধা গুহের নিবাস বরিশাল জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে; সে তাহার পিতৃব্যের সহিত ৭৬ নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে বাস করিত। মেয়েটি অতি উচ্চ বংশের, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের অন্যতম। শান্তির পিতামাতা কেহই জীবিত নাই। শান্তি তাহার পিতৃব্যের নিকট থাকিত।

শান্তি দেখিতে তেমন সুন্দরী নহে। সৌন্দর্য্য না থাকিলেও তাহার মুখে অপূর্ব্ব এক কমনীয়তা আছে। রংটা তেমন ফর্শা না হইলেও লাবণ্যপূর্ণ। কিন্তু তাহার চুলগুলিই বড় সুন্দর। ওরূপ সুন্দর চুল খুব কম মেয়েরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই চুলের জন্যই তাহাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিকট শান্তির সুন্দর চুল এবং নয়নের চঞ্চল দৃষ্টি বড়ই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পিতৃব্যের বাসায় থাকিয়া শান্তি সপ্তম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। স্কুলে সহপাঠিনীগণ সকলেই শান্তিকে ভালবাসিত। লেখাপড়ায় সে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এজন্য শিক্ষয়িত্রীমহলেও শান্তি প্রিয় হইয়াছিল। স্কুলে সে সূচী-কার্য্য, নৃত্য ও গীতেই বেশী পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। শান্তির সূচীকার্য্য সত্যই বড় নয়নরঞ্জক। তাহার সূচীকার্য্যে সূক্ষ্মাতিতর অব্যক্ত একটা সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত। নৃত্যেও সে বেশ পারদর্শিনী ছিল। উদয় শঙ্করের প্রসিদ্ধ 'শিব-নৃত্য, সাগর-নৃত্য প্রভৃতি অন্যান্য নৃত্যও সে বেশ সুন্দর পারিত। অবশ্য কোন প্রকাশ্য স্থানে সে নৃত্য করে নাই। বান্ধবীগণই তাহার এই নৃত্যের কথা জানিত। শান্তি বেশ গান গাহিতেও পারে, তাহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর।

বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে থাকিতেই শান্তির :পড়া বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় তাহারা বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে আসে। স্কুলে থাকিতে শান্তির দিনগুলি বেশ কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ দিনগুলি কাটান তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সময় কাটাইবার কোনরূপ পন্থা না পাইয়া সে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া লইল। বিবিধ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার গল্প, কবিতা ও উপন্যাস সে প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল।

রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ যেন সর্ব্বদা তাহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করিত। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' সে যে কতবার পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাইফেন', এবং বুদ্ধদেব বসুর দুই একখানি পুস্তক বিশেষ করিয়া তাহার প্রিয় ছিল।

শান্তি কবিতাও লিখিতে পারিত। এখন বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা হইতে নূতন এক প্রেরণা পাইয়া তাহার কবিতা এক নূতন গতি লইয়া বাহির হইতে লাগিল।

সকালে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে সময়টা একরূপ কাটিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া সে গল্প উপন্যাস পাঠ করিত, এবং মাঝে মাঝে কবিতা লিখিত। গল্প-উপন্যাস পাঠের না জানি কোন্ নেশা আছে! ইহা পাঠককে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। আবহমান কাল হইতে নর-নারীর হৃদয়ে প্রেমরূপ যে অগ্নি জ্বলিয়া আসিতেছে, তাহারই বিচিত্র বর্ণনা বিভিন্ন পুস্তকে পাঠ করিয়া শান্তির হৃদয়টা যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে সর্ব্বদাই যেন মনে হইত 'কি যেন নাই'। বিরাট এক শূন্যতা লইয়া শান্তি দিন রাত্রি আপনার মনের আগুনে আপনিই দহিয়া মরিত। নর-নারীর হৃদয়ে যখনই এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, যখনই সে মনে করে 'আমার কেহ নাই, আমি একা, নিতান্তই একা'—তখনই বুঝিতে হইবে তাহার মণের কোণে যৌবন অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রেমাকুল করিয়া দিতেছে। কলিকাতার বুকে অপরাহ্নের নীরব ছায়া যখন অজ্ঞাতে নামিতে থাকে, শান্তি তখন শূন্যমনে জানালার গরাদ ধরিয়া দূর দূরান্তের পানে যতটুকু দেখা যায় নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া থাকিত। দৃষ্টি যেন দূরে, বহুদূরে, যেন মানুষের দৃষ্টির বাহিরের কোন রাজ্যে। কিন্তু এমনি করিয়া দিনতো কাটেনা!

ইহাতে তো প্রাণের ক্ষুধা মিটে না! বরং যেন বাড়িতেই থাকে। যখন অদূরের কোন ছাদে সন্ধ্যার নীরব অন্ধকারে কথোপকথন নিরত একটি পুরুষ ও একটি নারীর অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিত, যখন পথ দেখিতে দিয়া কত পুরুষ নারীর সহিত হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে—তখন শান্তির নিজের অভাবের কথাটাই মনে হইত। ক্ষুদ্র দু'টী বাহু শূন্যে তুলিয়া কতদিন যে সে মাথা খুঁড়িয়া বলিয়াছে—ওগো নির্দ্দয় ভগবান্! সকলেরই যে সব আছে, আমারই নাই কেন!

এমনি করিয়াই দিন যাইতেছিল। সেদিন গৃহের কোন কাজ কর্ম্ম লইয়া একটু মনোমালিন্য হওয়ায় শান্তির অন্তরটা বড় তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বৈকালে জানালার নিকট বসিয়া এলোমেলো চিন্তা করিতেছিল; অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল পাশের একটি বাড়ীর জানালার দিকে। শান্তি দেখিল সেই বাড়ীর এক জানালা দিয়া একটি তরুণ তাহারই প্রতি নির্ণিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে। এইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই শান্তি একটু সরিয়া আসিল। জানালার পর্দ্দাটা ভাল করিয়া দিয়া দিল। কিন্তু তথাপি সে নিজের অজ্ঞাতেই পর্দ্দার ফাঁক দিয়া সেই দিকে তাকাইতে লাগিল। একজন তরুণ তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে—এ দৃশ্য শান্তি কেন, অনেক কিশোরীই হয়ত অবহেলা করিতে পারেনা। শান্তি দেখিতে লাগিল ছেলেটির মুখে যেন কে এক পোঁচ্ কালি মাথাইয়া দিয়াছে। ধুতির খুঁট দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ছেলেটি উৎসুকনয়নে বার বার পর্দ্দার দিকে তাকাইতেছে। বহুক্ষণ সে এইভাবে চাহিয়া রহিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া যখন সে স্থানত্যাগ করিবার উপক্রম করি, সেই সময় শান্তি সহসা পর্দ্দাটা অর্দ্ধেক সরাইয়া দিল। তরুণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল! তাহার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। এইবার শান্তি বুঝিল তরুণ সত্য সত্যই তাহাকে দেখিতেছিল। তখন গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছে, শান্তি জানালা দিয়া মুখটা ঈষৎ বাড়াইয়া দিল। চারি চক্ষুর মিলন ঘটিল। উভয়েই লজ্জিত হইয়া কিছুকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া লইল। আবার চাহিল। আবার দৃষ্টি বিনিময় ঘটিল। এবার দুইজনেই মৃদু হাসিল। এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে কে ডাকিল—"যাই"—বলিয়া শান্তি যাইতে অগ্রসর হইল। কিন্তু যাইতে যেন আর পা ওঠে না। দেহ মন সবাই যেন জানালার সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। বহুকষ্টে নিজেকে সাম্‌লাইয়া শান্তি ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিতে করিতে ভাবিল—"হায়, আমি কি অন্ধ"!

ছেলেটি কে, শান্তির তাহা অজানা ছিল না।

ছেলেটির নাম বিনয়ভূষণ মুখার্জ্জি। বিনয়দের বাড়ীর সংলগ্ন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই শান্তিদের পরিবার বাস করেন। বিনয় নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঝামাপুকুর রাজবাড়ীতে সে চাকুরী করে।

এই বিনয়ের কথা শান্তি বহুবার বিনয়ের বাড়ীর লোকের মুখে শুনিয়াছে। শুনিয়া সে বড় গা-গ্রাহ্য করে নাই। আজ এই প্রথম সে বিনয়কে দেখিল। সে জানিত না বিনয় দেখিতে এত সুন্দর। তাহার মনে হইল সে তো বহু পুরুষ দেখিয়াছে, কিন্তু এমনটি তো আর দেখে নাই! সহস্র সহস্র পুরুষ প্রত্যহ পথ দিয়া যায় আসে, কিন্তু এমন লোক তো আর চোখে পড়ে নাই। সহসা যেন তাহার মনে হইল—"এই সেই! ইহারই সহিত আমার হৃদয় জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া বাঁধা আছে।'

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেদিন শান্তি বিছানায় ছটফট করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—কতদিন ধরিয়া ওই ছেলেটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে আমার ছবি বুকে আঁকিতেছে কে জানে? কিন্তু

কি অসীম ধৈর্য্য তার! কতদিন ধরিয়া—একমাস, দুইমাসও হইতে পারে—কে জানে কতদিন ধরিয়া সে অম্‌নি চাহিয়া আছে। আর সে কিনা একবারও ওদিকে ভুলিয়াও তাকায় নাই! আশ্চর্য্য! ইহাকেই বলে দৈব!

দুপুর বেলায় সকলে আফিসে চলিয়া গেলে এবং প্রবীণারা দিবা নিদ্রার জন্য শয়ন করিলেন সে বিনয়কে চুপি চুপি দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনয় ঝামাপুকুর রাজবাড়ীর চাকরী করে। দুপুরে তাহার বিশ্রাম, এই সময় সে বাড়ী থাকে; সহসা একটা জানালা খট্ করিয়া খুলিয়া গেল। কম্পিত বক্ষে শান্তি চাহিয়া দেখিল সেই মূর্ত্তি। শান্তির চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। দুইটি জানালা নিকটে নহে। অল্প কিছু ব্যবধান আছে। তথাপি শান্তির মনে হইল সে যেন বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। একটু সরিয়া জানালার নিকটে মুখ রাখিয়া শান্তি বসিল। বিনয় একদৃষ্টে শান্তির প্রতি চাহিয়া আছে। যেন সে প্রস্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের কোন দৃশ্য বা শব্দ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহার সকল ইন্দ্রিয়, সকল অন্তঃকরণ যেন শান্তিতেই নিবদ্ধ। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিনয়ও বসিল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছে, তথাপি একটা ব্যবধান। বিনয়ের এ ব্যবধান দূর করিতে ইচ্ছা হইল। দুইটি প্রাণ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, অথচ বাক্যালাপ হইবেনা, এ কিরূপ? কিছুকাল পরে বিনয় একটি বালককে দিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিল। কম্পিত হস্তে সে পত্র শান্তি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিল। কি অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ পত্র! শান্তির মনে হইল এমন প্রেমপূর্ণ পত্র সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বুঝি আর কেহ লেখে নাই! এমন করিয়া আত্মনিবেদনও বুঝি আর কেহ করে নাই।

শান্তিকে গোপনে দেখা করিতে বিনয় অনুরোধ করিয়াছে। দুইজনে সন্ধ্যার এক অবসরে কিছুকালের জন্য যাহাতে বাক্যালাপ করিতে পারে—সেই অনুরোধই বিনয় জানাইয়াছে। শান্তি বালকটির হাতেই পত্রদ্বারা তাহার সম্মতি জানাইল। সে পত্র পাইয়া বিনয়ের মুখে আনন্দ যেন আর ধরে না। আবার তাহারা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল।

প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে তাহাদের দেখা হইতে লাগিল। তাহাদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা শিল্পকার্য্য শান্তি উপহার দিতে লাগিল, বিনয়ও প্রতিদানে অনেক কিছু দিয়াছে। বিনয় একদিন সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কাজরী' পুস্তকখানি শান্তিকে পড়িতে দেয়। শান্তির পাঠ শেষ হইলে বিনয় জিজ্ঞাসা করে—"কেমন লাগিল?" শান্তি উত্তর দেয়—"চমৎকার লাগিয়াছে।" ইহার পর হইতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি এতদূর আসক্ত হইল যে, ঘটনাটি প্রকাশ হইয়া গেল। শান্তির কাকা সতর্ক হইলেন, দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও শান্তি ও বিনয়ের প্রেম বিন্দুমাত্র হ্রাস হইল না। শান্তি গোপনে বিনয়কে পত্র লিখিত। বিনয়ও প্রত্যুত্তর দিত। গোপনে উপহার দেওয়া চলিতে লাগিল। শান্তি নিজ হাতে প্রস্তুত একখানা টেবিল-ক্লথ, কয়েকখানা ছবিকে কাপড় পরাইয়া বিনয়কে ইতিমধ্যে দেয়। বিনয়ও নানা দ্রব্যাদি দেয়। একদিন গোপনে একাসনে দুইজন বসিয়া ফটো তুলিয়া ফেলিল।

শান্তির কাকা যখন দেখিলেন কিছুতেই কিছু হইতেছে না, তখন তিনি শান্তিকে গৃহে রাখা আর নিরাপদ মনে করিলেন না। পরামর্শের জন্য তাঁহার এক আত্মীয়কে ডাকাইলেন। উভয়ে নানা প্রকার

পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত হইল আত্মীয়টী শান্তিকে বুঝাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবে, সেই অনুসারে তিনি শান্তির নিকটে যাইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ তোমার এ কার্য্য অন্যায় হইতেছে। ইহার পরিণাম ভাল নহে। তোমার যৌবনান্তে বিনয় তোমাকে পায়ে ঠেলিয়া দিবে। বিনয় তোমাকে বিবাহ করিলে সে গৃহে শান্তি পাইবে না, কারণ সে ব্রাহ্মণ সন্তান। সে গৃহে স্থান পাইবে না, পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, আরও নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট পাইবে। বিনয়ের দুঃখের কথা ভাবিয়াও তোমার এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য!"

শান্তি এ সকল কথা শুনিয়াও শুনিল না। তাহার এক কথা—সে বিনয়কেই বিবাহ করিবে। বিনয় ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। আত্মীয়টীর উপদেশে সে মনে মনে বলিত—"আপনার পত্নীকে যদি বলা হয়, তোমার স্বামীকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তিনি যেরূপ মনে করিবেন আমিও সেইরূপ মনে করিতেছি। আমি যাহাকে আত্মনিবেদন করিয়াছি তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? এ কাজ কেহ পারে না।'

ঐ ভদ্রলোক ও শান্তির কাকা কিছুতেই যখন শান্তিকে বিরত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া শান্তিকে নারী-কল্যাণ আশ্রমে রাখিয়া আসেন।

নারী কল্যাণ আশ্রমে আসিয়া শান্তি বিবাহের জন্য একরকম পাগল হইয়া যায়। যে নারী বিবাহের কথা বলে, তাহাকেই সে বিনয়ের সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইয়া দিতে অনুরোধ করে। আশ্রমের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিসেস সরকার শান্তিকে জননীর মত স্নেহ করিতেন। তিনি শান্তিকে এ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য নানাপ্রকার

উপদেশ দিলেন। এ-কার্য্যের যত দোষ-ত্রুটি, যত কুফল, সকলই তিনি বিশদভাবে শান্তিকে বুঝাইয়া দেন। শান্তি নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইত মাত্র। কোন উত্তর দিত না। মিসেস সরকারের কোন উপদেশই তাহার অন্তঃকরণে স্থান পাইল না।

আশ্রমে আসিয়াও শান্তি বিনয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য অস্থির হয়। কোন উপায়ে বিনয়কে জানাইয়া সে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আশ্রমের ছাদ হইতে বিনয়ের সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত করে। আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বিনয়কে রাস্তায় রাখিয়া সে গোপনে নানাভাবে চিঠির আদান প্রদান করে, এমন কি বিনয়ের সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করে।

প্রায় প্রত্যহই সে বিনয়ের সহিত এইভাবে দেখা করিত। ঘটনাটি চাপা রহিল না। আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষের কাণে উঠিল। তাঁহারা সতর্ক হইলেন। একদিন রাস্তায় অবস্থানকালে বিনয় আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আশ্রমের অফিসঘরে নীত হয়। বিনয় তথায় আসিবামাত্র শান্তি পাগলের মত ছুটিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই তাহার ভাবী পতি বিনয়কে ক্ষমা করিতে বলে। কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তি সকলের নিকটই করযোড়ে ক্ষমা প্রর্থিনা করিতে লাগিল। আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ শান্তির কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া বিনয়কে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। সুবোধ বালকের মত বিনয় তাহাই করিয়া এ যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করে। এদিকে এই দৃশ্য দেখিতে রাস্তায় ভীষণ ভীড় জমিয়া যায়। কিন্তু ইহার পরও শান্তি-বিনয়ের দেখা সাক্ষাৎপূর্ব্বের মতই চলিতে থাকে।

ইহার কিছুদিন পরে আশ্বিন মাসে গৌড়ীয় মঠে এক মেলা হয়। ঐ মেলয়ে নারী কল্যাণ আশ্রমের মেয়েরা যায়, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে যায়। বিনয়ও ঐ মেলায় গিয়াছিল। সেখানে দু'জনে যুক্তি করিয়া কোনরূপে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইতে সক্ষম হয়। মেলা হইতে বাহির হইয়া এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করিয়া শান্তি বিনয়ের সহিত নিজগৃহে চলিয়া আসে।

শান্তি বাড়ী আসিবামাত্র শান্তির কাকা তাহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু শান্তি একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কাকার কথার কোন উত্তর দিল না। শান্তির কাকা তাহার কোন উত্তর না পাইয়া বিস্তর ডাকাডাকি করেন। তাহাতে ফল না হওয়ায় তিনি কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শান্তিকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করেন। এমনকি যুবতী শান্তির গায়ে তিনি হাত পর্য্যন্ত তোলেন। প্রহারের ফলে শান্তির কথা বলিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ছিল না। তাহার এমন সুন্দর চুলও (কথাগুলি শান্তির) অনেক ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আশ্রমে কয়েকদিন চিকিৎসা করার পর তবে সে সুস্থ হয়।

শান্তিকে না পাইয়া আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ শান্তির জন্য অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর তাঁহারা শান্তিকে তাহার নিজ বাড়ীতে দেখিতে পান। শান্তিকে আবার আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আশ্রমে আসিয়া শান্তি কেবল কবিতা লিখিত। বলা বাহুল্য, সকল কবিতাই বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লেখা। এইরূপে কিছুদিন যায়। কিছুদিন পর আবার পূর্ব্বের মত আশ্রমের ছাদ হইতে শান্তি বিনয়কে দেখিবার বন্দোবস্ত করে। পূর্ব্বের মতই আবার দেখা-সাক্ষাৎ চলিতে লাগিল। অনুরাগে বাধা পড়ায় তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল।



রাণী—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

এই সময় আলিপুরের উকিল বাবু ঈশান দাস আশ্রমের একটী মেয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যান। শান্তির অনুরোধে ঐ মেয়েটী ঈশান বাবুকে অনুরোধ করেন যাহাতে শান্তির সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ হয় সে জন্য চেষ্টা করিতে। সকল বিষয় শুনিয়া ঈশান বাবু বলেন, শান্তির কাকা বিবাহ না দিলে তিনি কি করিবেন! শান্তির কাকা ও আত্মীয়গণ বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন, উকিল বাবু আর কি করিবেন! এখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে এদের মিলন না ঘটিলে ভয়াবহ পরিণাম সুনিশ্চিত।

শান্তি এই উকিল বাবুর খবর পাইয়া তাঁহাকে মেসো-মহাশয় সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখে। ঐ চিঠিতে বিবাহ ঘটাইয়া দিবার জন্য সে বিশেষভাবে অনুরোধ করে।

বিনয় শান্তির নিকট উকিল বাবুর ঠিকানা জানিয়া মাঝে মাঝে পরামর্শের জন্য তাঁহার নিকট আসিত। আশ্রমেও বিনয় শান্তির খবর লইত।

ইহার কিছুদিন পর 'বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের' নূতন বাড়ীতে দোল পূর্ণিমার সময় এক মহিলা মেলা হয়। ঐ মেলায় নারীকল্যাণ আশ্রমের এক ষ্টল্ হয়। অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে শান্তিও মেলায় যায়। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট-মত বিনয়ও ঐ মেলার দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল। শান্তি এখানে আসিলেও বিনয়ের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারে নাই। ঐ দিন নারীকল্যাণ আশ্রমের একটি বিধবার বিবাহের দিন ছিল। কালীঘাটের হিন্দুমিশনে ঐ বিবাহ হয়। বাণী-ভবন হইতে নারীকল্যাণ আশ্রমের মহিলাগণ সুপারিণ্টেণ্ডেটের সঙ্গে ঐ মেলায় যান। বিনয়ও সাইকেলে তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

মহিলাগণ হিন্দু-মিশনের বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র বিনয়ও ঐ বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়। নারীকল্যাণ আশ্রমের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

৫

বিনয়কে পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন, এখানেও তাহাকে দেখিয়া মিশন কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয় বলেন। মিশনের কৃতি ব্রহ্মচারীগণ বিনয়কে ধরিয়া যথেষ্ট লাঞ্ছিত করেন। বিবাহ সভায় এই প্রকার প্রেমিকের লাঞ্ছনা করা একমাত্র ব্রহ্মচারীর পক্ষেই শোভা পায়।

এই লাঞ্ছনা শান্তির বুকে নিতান্তই বাজিয়াছিল। ইহার পর শান্তি কৌশল করিয়া আশ্রম হইতে একাকিনী পলায়ন করিয়া ঝামাপুকুরে পূর্ব্বপরিচিত এক বাড়ীতে আসিয়া বিনয়কে দেখা করিতে সংবাদ দেয়। যে বাড়ীতে শান্তি পলাইয়া আসিল, তাঁহারা শান্তির কাকাকে খবর দিলেন। শান্তির কাকা এই সংবাদ পাইয়া বিনয়ের মনিব ঝামাপুকুর রাজবাড়ীর কুমার হীরেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট বিনয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

কুমার বাহাদুর বিনয়ের পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শান্তির কাকা ও বিনয়ের পিতাকে তিনি ঘটনার আন্তন্ত বিবরণ বলিতে অনুরোধ করেন। সকল ঘটনা শুনিয়া কুমার বাহাদুর শান্তির কাকাকে বলেন,—"এতদিন কন্যার বিবাহ দেন নাই কেন? এখনও সময় থাকিতে বিবাহ না দিলে ইহার পরিণাম ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?" বিনয়ের পিতারও এ বিবাহে অমত ছিল। কুমার বাহাদুরও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতি নহেন, তবে প্রেম যেখানে অবাধ গতিতে চলিয়াছে তাহাতে বাধা না দেওয়াই সঙ্গত—এই বিবেচনায়ই বোধ হয় কুমার বাহাদুর বিবাহের উদ্যোগী হইয়া থাকিবেন। জন সাধারণও তাঁহার এই কার্য্য সমর্থন করিয়াছে। বিশেষতঃ কাহারও আপত্তি শুনিবার মত সময় তখন ছিল না।

বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। হিন্দুমিশনেই বিবাহ সম্পন্ন করা স্থির হইল।

রেজেষ্টারী করিয়া হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর-কন্যা সুখেই আছে। বিবাহের 'জল' লাগিয়া শান্তি এখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যে হিন্দুমিশন বিনয়কে লাঞ্ছিত করিয়াছিল, তাহারাই বিনয় শান্তির আদর্শ প্রেমকে সহস্রকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছে।

কুমার বাহাদুর বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছেন। বিনয়ের চুল ছোট থাকায় কুমার বাহাদুর তাঁহার নিজের একটা জড়ীর টুপি বিনয়ের মাথায় দিয়া তাহাকে বিবাহ-সভায় পাঠাইয়া দেন।

কুমার বাহাদুর বিনয়কে বিশেষ স্নেহ করেন। বিনয় যাহাতে তাহার পিতার বাড়ীতে স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিতে চেষ্টা করিবেন—ইহা বলাই বাহুল্য।

শান্তি বলে—"কাকা এ বিবাহে কেন যে বিরক্ত বুঝিনা! ইহাতে কাকার তো কোন নীচকার্য্য হইলনা, বরং তাঁহার কুলের ভালই হইল। এ বিবাহে যদি কেহ ছোট হইয়া থাকে, তবে ওর (বিনয়ের পরিবারের।)"

বিবাহের পর হইতে শান্তি ব্রাহ্মণ বধূর ন্যায় শুদ্ধাচারিণী থাকিতে চেষ্টা করিতেছে—শূদ্রস্পৃষ্টান্ন সে এখন গ্রহণ করে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা তাহাদের জীবন সুখময় হউক। শান্তির নিকট শুনিয়া তাহাদের জীবনী লিখিত হইয়াছে এবং তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া ইহা মুদ্রিত হইল। ফটোখানাও শান্তি আমাদিগকে মুদ্রিত করিতে দিয়া উপকৃত করিয়াছে, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীমতী শান্তিসুধা উকিল বাবুর নিকট যে সকল চিঠি লিখিয়াছে তাহা হইতে একখানা মাত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল।

শ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণতিপূর্ব্বক সেবিকার বিনিত নিবেদন এই যে,—মেসো মহাশয়

আপনি আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আপনার প্রেরিত ওর চিঠি পেয়েছি এবং সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। আপনি আমার বাবার মত, আপনি এই হতভাগী মেয়েকে উদ্ধার করিবেন, যাহাতে আমার ভাল হয়। আপনি যদি আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমার পৃথিবীতে কেউ নাই কষ্ট বুঝিবার, তাহলে চিরদিন আশ্রমে থাকতে হবে। কারণ কাকা আমার আর খোঁজ নেয়না, এবং এদের বলে গেছে যে আপনাদের যা খুসি করিতে পারেন, 'আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নাই।' আমাকে একটা পয়সা দিয়াও সাহায্য করেনা। যাক আমি কাকাদের সাহায্য চাই না, তবে আমার একভাবে দিন কেটে গেলেই হবে, তবে আপনি আমার মনের বাসনা পূরণ করিবেন। আশ্রম থেকে কিছু হবেনা, আপনি আমার জন্য কষ্ট করিতে ভুলিবেন না। আপনি কাকার কাছে একবার জেনে আসবেন যে কাকার কি রকম মত। আপনি চেষ্টা করিবেন যাহাতে ও কিছু আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে, তাহার বন্দোবস্ত করে দিবেন। ওর চাকরী না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে আশ্রমে থাকিতে হবে, ততদিন আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমার এখানে অনেক জিনিষের দরকার হয়েছে, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই; আমাকে বাড়ীর থেকে আজ পর্য্যন্ত কিছু দিতেছে না এবং দেবেনা। আপনি আমার উপর একটু দয়া করিবেন। যাহাতে কাজটা শীঘ্র করিতে পারেন করিবেন। আমায় নিরাশা করিবেন না। আজ আমি পৃথিবীতে একা, আপনিও তুচ্ছ বলে উড়াইয়া দিবেন না। এই অবলা বালিকার জীবনটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার কাছে ও যে জিনিষ দিবে আপনি দয়া করিয়া আমায় দিবেন নতুবা পাবনা। আপনি আমাকে কন্যার মত দেখিবেন, এবং ওকে একটা চাকরীর চেষ্টা

করিয়া দেবেন এবং পরামর্শ দেবেন যাহাতে ভাল হয়। আমি আজ ওকে পাবার জন্য এত কষ্ট করিতেছি এবং সব ত্যাগ করে আশ্রমে পড়ে আছি। আমার কি ভগবান কষ্ট সার্থক করিবেনা। আমি সব ত্যাগ করিতে পারিব কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারিব না। এটা মনে জানিবেন, আমার এই প্রতিজ্ঞা। আমার অনেক কথা ছিল, বেশী কি লিখিব, দিদি যে পর্য্যন্ত এখানে আছে সে পর্য্যন্ত আপনাদের সংবাদ পাব এবং এর ভিতরে যা করিবার করিবেন।

(মাসীমা) লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে আমার বিষয় জিজ্ঞেস করিবেন তাহা হইলে সমস্ত জানিতে পারিবেন। পরে আপনাকে সব খুলিয়া লিখিব। আপনি আমাকে একখানা কাগজে লিখে জানাবেন। তাহা হইলে আমি সমস্ত শুনিতে পারিব। আপনার কোন ভয় নাই। আমি খুব সাবধান আছি। আমাকে এত কাঁচা মেয়ে ভাববেন না, আমি সে রকম মেয়ে নই। আমায় বিশ্বাস করিবেন এবং দিদির কাছে শুনিতে পাইবেন যে কি রকম মেয়ে আমি। আপনি আমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে ভুলিবেন না। আপনি যদি একবার দয়া করিয়া ওর বাবার কাছে বলিতে পারেন যে আপনার ছেলের এস্থানে বিয়ে না দিয়া পারিবেন না, ছেলের বাধ্য হয়ে বিয়ে করিতে হবে, ওর বাবা কি বলেন শুনিয়া আসিবেন। যাহাতে এই কাজটা হয় করিতে চেষ্টা করিবেন। দিদির কাছে শুনিবেন, আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—

হতভাগিণী কন্যা

শান্তিসুধা গুহ

সীতা দেবী + সুধীর চৌধুরী

যে শিক্ষা মানুষের চিত্তের প্রসারতা বৃদ্ধি করে, যে শিক্ষা সঙ্কীর্ণতা নাশ করিয়া মানুষের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করিয়া দেয়, যে শিক্ষা জাতিগত ভেদবুদ্ধির বিনাশ সাধন করিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়াই চিনিতে—চাক্‌চিক্যময় বাহিরাবরণ দেখিয়া মুগ্ধ বা বাহিরের অনাড়ম্বর দেখিয়া হতাশ না হইয়া অন্তরের গোপনতম প্রদেশে অবতরণ করতঃ সেখানকার খাঁটী মানুষটী চিনিয়া লইতে সহায়তা করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পিতামাতার যত্ন ও শিক্ষকের শিক্ষাদান সেইখানেই সার্থক। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় আজীবন লোক-শিক্ষক যে স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু শিক্ষাদানই যথেষ্ট নহে, শিক্ষা গ্রহণেরও ক্ষমতা থাকা চাই। শিক্ষাদান অপেক্ষা শিক্ষাগ্রহণ বরং আরও ক্ষমতা-সাধ্য। যেখানে শিষ্য বা শিষ্যা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, শিক্ষাদান সার্থক হয় সেখানেই। রামানন্দবাবুর শিক্ষাদানও সার্থক হইয়াছে। তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সীতা দেবী আভিজাত্যের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া অন্তরের প্রেরণায় যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে বাহিরের চাক্‌চিক্য বা আভিজাত্যের বিলাস-চিহ্ন আদৌ নাই। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতা সীতা দেবী তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে অবগাহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই শ্রীযুত চৌধুরী অভিজাত্য-গৌরবে বা অর্থ-সম্পদে তাঁহার পিতা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ন্যূন হইলেও

একটী সুকুমার কবি-চিত্ত তাঁহার অন্তরকে যে কত মহিমাময় করিয়া রাখিয়াছে, এ সত্য তাঁহার নিকটে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তাই তিনি সমাজের ও সংসারের বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্তরের প্রবেদনকেই বড় করিয়া দেখিলেন—সুধীরকুমারের উদ্‌গত হৃদয়ের প্রেমাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ অভিজাত্য-বিলাসের কুসুমাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের ধূলিকঙ্করময় পথে পদার্পণ করিলেন। প্রেমের রাজ্যে এ আত্মসমর্পনের—এ আত্মবিসর্জ্জনের মর্য্যাদা যেমন অনেকখানি—মনুষ্যত্বের দরবারেও তেমনি।

সুধীরকুমারেরও গৌরব এখানে কম নহে। যে প্রেম-সাধনায় তিনি ঐশ্বর্য্যবিলাসের নর্ম্ম হর্ম্ম্য হইতে ধনী-দুলালীকে আপনার কুটীর-প্রাঙ্গনে টানিয়া আনিয়াছেন, সে প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ সাধারণ মানবের কার্য্য নহে। তাইতো দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের মধ্যে অসাধারণ তাঁহারই পরিণয়-কাহিনী লইয়া আমরা আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিলাম।

রামানন্দবাবু তাঁহার কন্যাদ্বয়কে যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। পিতার সদ্দৃষ্টান্তে কন্যাদ্বয়ের মধ্যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস দেখা দিলে তাহাতেও তিনি উৎসাহ দান করিতে বিরত হন নাই। বরং স্বীয় মাসিকপত্রের অনেকগুলি পাতাই কন্যাদ্বয়ের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি জর্ণালিষ্টের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য অপেক্ষা অন্ধ পিতৃস্নেহেরই অধিক পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। সাহিত্য চর্চ্চার যে সুযোগ শান্তা দেবী ও সীতা দেবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেরূপ সুযোগলাভ দূরের কথা তাহার সামান্য অংশও বাংলা দেশের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

শ্রীযুক্তা সীতা দেবী প্রধানতঃ রচনা করেন গল্প উপন্যাস। এই সকল

গল্প-উপন্যাসের প্রত্যেকটীতেই যে একজন নায়িকা থাকে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণী নায়িকার মনে পুরুষ-সঙ্গলাভের বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, প্রবাসীর সম্পাদক হইয়া প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনাবলীর সম্বন্ধে এই তথ্য রাবানন্দবাবু নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন বিজ্ঞ সাংবাদিক যে কন্যা-স্নেহে অন্ধ হইয়া না পড়িয়াই ঐ সকল রচনার 'কপি' প্রেসে দিবেন, এরূপ মনে করা যায় না।

আর কন্যাও নিতান্ত বালিকা নহেন। বি এ পাশ করিবার পরেও কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বাঙালীর মেয়ে হিসাবে নিশ্চয়ই যৌবন অতিক্রমণের কাছাকাছি পৌছিয়াছেন।

এই বয়সেও যে সীতা দেবীর বিবাহ হয় নাই, তাহার কারণ অনুমান করিতে গিয়া আমরা ব্রাহ্মবালিকার বিবাহ সচরাচর যে সকল কারণে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তাহাই মাত্র আলোচনা করিবার অধিকারী।

(১) হয়তো ব্রাহ্ম তরুণীর পিতা মনে করেন যে, কন্যা যখন শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন অপর কোন আলোকের প্রয়োজন তাহার হইবেনা ;

(২) কন্যা সাহিত্যিক হইলে হয়তো তিনি এই ভুলই করেন যে, সাহিত্য-সৃষ্টি কন্যার মনকে সংসার-সৃষ্টির প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়া থাকিবে ;

(৩) হয়তো বা তাঁহারা ইহাই বিবেচনা করেন যে, কন্যাকে যখন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই কন্যার প্রতি তাঁহাদের সমুদয় দায়িত্ত অন্তর্হ্ত হইয়াছে। কন্যা এখন নিজেই নিজের জীবন-সঙ্গী খুঁজিয়া লইবে ;

(৪) হয়তো তাঁহারা কন্যার উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পান না, অথবা—

(৫) পিতা কন্যার জন্য পাত্র স্থির করিলেও শিক্ষিতা কন্যার সে পাত্র পছন্দ হয় না।

সীতা দেবীর বিবাহ কোন্ কারণে বিলম্ব ঘটিয়াছিল জানিনা। শ্রীযুত সুধীরকুমার চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হইল, সেই কথাই বলিতেছি।

শ্রীযুত সুধীরকুমার চৌধুরীর পিতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চৌধুরী জাতিতে কায়স্থ। চৌধুরী-পরিবারের অবস্থা এককালে খুবই ভাল ছিল, ইদানীং কতকটা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সুধীরকুমারের কৈশোর এবং যৌবনের প্রথমাবস্থা তাঁহাদের ময়মনসিংহের বাড়ীতেই কাটিয়াছে।

এই বাড়ীটী মৈমনসিংহ সহরস্থ ব্রাহ্মসমাজের গাত্র-সংলগ্ন। সুতরাং খাঁটী হিন্দু-পরিবারের ছেলে হইলেও সুধীরকুমার মাঝে মাঝে ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন এবং আর দশজন যুবকের ন্যায় ব্রাহ্ম তরুণীগণের কণ্ঠ-নিসৃত দু'একখানা গান শুনিয়াই চলিয়া আসিতেন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্ম তরুণীর গান শুনিতে সমাজে গেলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের কোন লক্ষণই তখন পর্য্যন্ত সুধীরকুমারের মনে দেখা দেয় নাই। সুধীরের অগ্রজ হিমাংশু ভয়ঙ্কর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। সুধীর তখন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

তবে মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যয়ন কালে সুধীরকুমারের মধ্যে কতকগুলি ভাবান্তর লক্ষিত হয়, ইহা নিশ্চিত। সুধীরের পিতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চৌধুরী যৌবনে একসময়ে একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে পিতার রোপিত সেই বীজ যে সুদীর্ঘকাল পরে পুত্রের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, ইহা কে ভাবিতে

পারিয়াছে? অথচ লক্ষণ দেখা দিল তাহারই। সুধীর লম্বা চুল রাখিয়া তাহা পিছনের দিকে উল্টাইয়া দিতেন, রবিয়ালী ধাঁচে চাদরখানা বুকে জড়াইয়া একটু কুব্জ হইয়া ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতেন, নারী-সুলভ মিহিগলায় কথা বলিতেন।

তারপর কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি প্রবাসী আফিসে কাজ লইলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া কে মনে করিবে, তিনি আলোকবিহীন হিন্দু সমাজের! ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মেসে থাকিয়া যখন সুধীরকুমার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ব্রাহ্ম-মন্দিরের পাশের গলিতে অবস্থিত প্রবাসী আফিসে যাতায়াত সুরু করিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে মৈমনসিংহ সহরের আয়ত্ত অভিজ্ঞতাটুকু তখন তাঁহার কাজে লাগিল। ব্রাহ্মিকাদের সহিত কি ভাবে মিশিতে, কথা বলিতে, চলিতে ফিরিতে হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মের আওতার মধ্যে আসিয়া পড়ায় তাঁহার কোন অসুবিধা হইল না। রামানন্দবাবুর মেয়েরা কখনও প্রবাসী আফিসে আসিলে (অবশ্য প্রবাসীর কর্ম্মচারী সংখ্যা তখন অতি অল্পই ছিল) তিনি তাঁহাদের সহিত সহজভাবেই ব্যবহার করিতে পারিতেন।

সীতা দেবীর সহিত এই সময়ে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সুধীরকুমার তাঁহার একজন বন্ধুর নিকটে বলিয়াছিলেন যে, 'এই সে স্বপ্ন দৃষ্টা বা কল্পিতা নায়িকা—যাঁহাকে লইয়া তিনি বহু গল্প রচনা করিয়াছিলেন।'

সুধীরকুমারের পিতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী একজন প্রবীন সাহিত্য-সেবী। অগ্রজ হিমাংশুকুমারও গল্প-কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। মৈমনসিংহ কলেজে অধ্যয়নকালে সুধীরকুমারও কবিতা লিখিতেন। এইবারে তিনি পূর্ণোদ্যমে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার এই সময়কার রচনাবলীর অধিকাংশই ছিল প্রেমের কবিতা। মাঝে মাঝে

দুই একটী গল্পও তিনি লিখেন। তাঁহার এই সকল গল্পের অধিকাংশই শিক্ষিতা তরুণীগণকে নায়িকা করিয়া লিখিত।

সীতা দেবীর সহিত সুধীরকুমারের বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটকের ঘটকালীতে বা পিতামাতার মধ্যস্থতায় স্থিরীকৃত হয় নাই। পাত্র ও পাত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। পাত্রের পিতা শরৎচন্দ্র নাকি প্রথমে অমতই করিয়াছিলেন। পাত্রীর পিতা শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দেন নাই। প্রজাপতি এখানে নিরাপত্তিতেই মীনকেতনের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

কি করিয়া যে ইহা সংঘটিত হইল, সেকথা কে বলিবে? ব্রাহ্মিকারা অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত হইলেও এমন একটী আভিজাত্যের বর্ম্ম তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সহজে যাহা ভেদ করিয়া তাঁহাদের গণ্ডীমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। স্বীয় পিতার একজন সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারীর সম্মুখে প্রভু-দুহিতার এই আভিজাত্যের বর্ম্ম যে কোনও সূত্রে ক্ষুণ্ণ হইবে, ইহা অপ্রত্যাশিত, তথাপি যে সীতা দেবী ও সুধীর চৌধুরীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইল, তাহার কারণ বোধকরি সাহিত্য-চর্চ্চার মারফতে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন। কাব্য ও সাহিত্য-চর্চ্চার সুদৃঢ় যোগসূত্রে সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ করি সামাজিক ভেদবুদ্ধি এই যোগরশ্মি ছিন্ন করিতে পারে নাই। পরন্তু তাঁহাদের মিলন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

রামানন্দবাবুর রাজা রামমোহন রায় রোডস্থ বাসায় এই বিবাহ সম্পন্ন হয়, রামানন্দবাবুর ন্যায় একজন সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ধনী-কন্যার বিবাহ যেরূপ সমারোহের সহিত নিষ্পন্ন হইবার কথা, এ বিবাহে সেরূপ সমারোহ তো হইলই না বরং অতি সংক্ষেপে দু'দশ জনকে

মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইল। সুধীরের পিতা এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বেহাই আমাকে আদর যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহ-কার্য্য এত সংক্ষেপে নিষ্পন্ন হইয়াছে যেন ইহা সহায়হীন দীন-দরিদ্রের ঘরের বিবাহ।"

বিবাহের এই আড়ম্বরহীনতায় বর ও কন্যা নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হ'ন নাই। তাঁহাদের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত মন নিশ্চয়ই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে দৃক্‌পাত না করিয়া আসল মিলনেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাই দাম্পত্য-জীবনে আজ তাঁহারা সুখী। কয়েকটী কন্যা সন্তানের জনক-জননী হইয়া সুখী ও সন্তুষ্টচিত্তে গৃহধর্ম্ম পালন করিতেছেন।

অতঃপর আর সুধীরকুমার শ্বশুরের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। বিশেষতঃ এখানে তিনি নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারী হইয়া থাকিলে তাঁহার পত্নী সীতার এবং শ্বশুর রামানন্দবাবুরও বড়মুখ ছোট হইয়া যায়। তাই বিবাহের পরেই তিনি প্রবাসীর চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন এবং স-স্ত্রীক্ রেঙ্গুনে স্বীয় ভ্রাতা শ্রীযুত সুধাংশু চৌধুরীর নিকটে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া একটা লিমিটেড্ কোম্পানী খুলিয়া তাহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়া রহিলেন। অবশ্য সীতা দেবীও প্রবাসীতে পূর্ব্ববৎ লিখিতেন এবং তাহার জন্য মাসে মাসে সেই লেখার মূল্য হিসাবে পিতার নিকট হইতে মোটা অঙ্কের টাকা পাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য আর তাঁহাকে অর্থ কৃচ্ছ্রতায় ভুগিতে হইল না।

স্বামীর সহিত রেঙ্গুনে প্রবাস যে স্বামীতে একান্ত অনুরাগিণী সীতা দেবীর পক্ষে পরম সুখের হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার এদিক্‌কার রচনাবলী হইতেই পাই। রেঙ্গুন গমনের পর হইতে ইদানীং তিনি যত গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার প্রায় সবগুলির মধ্যে তাঁহার

রেঙ্গুন-প্রবাসের সুখ-স্মৃতির প্রভাব রহিয়াছে—গল্প বা উপন্যাসগুলির পাত্র পাত্রীকে কোন না কোন প্রকারে তিনি রেঙ্গুনে লইয়া যাইতেছেন।

যাহাহৌক্ রেঙ্গুনে কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর কারবার ফেল পড়ায় সুধীরকুমার সস্ত্রীক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং একটী বুক্-বাইণ্ডিং এর কারখানা খুলিলেন। এই কারবারও চলিল না। সম্প্রতি রামানন্দবাবুর চেষ্টায় এক ইন্সিওর কোম্পানীতে তাঁহার কাজ হইয়াছে, তিনি সেই কাজই করিতেছেন। সীতা দেবীও প্রবাসীর সম্পাদনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ গ্রহণ করিয়া মোটা অঙ্কের মাসোহরা বা পারিশ্রমিক পাইতেছেন। তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর সাহিত্য-চর্চ্চা আজকাল বেশ জোরেই চলিতেছে এবং সম্প্রতি প্রবাসীতে একসঙ্গে তাঁহাদের লিখিত দুইখানি উপন্যাস—সীতা দেবীর "মাতৃঋণ" আর সুধীর চৌধুরীর "শৃঙ্খল" মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

পিতার অধীনস্থ অল্প বেতনের কর্ম্মচারীকে বিবাহ করা সাংসারিক দিক্ হইতে যেরূপই বিবেচিত হৌক্ না কেন, যে অনুরাগ এরূপ বিবাহ সংঘটিত করায়, প্রেমের দরবারে তাহার আসন নিম্নে নহে। এরূপ তেজস্বিতা ব্রাহ্ম মেয়েদের মধ্যে বিরল না হইলেও ব্রাহ্ম ছেলেদের মধ্যে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্যই সিটিকলেজে সরস্বতী পূজা সম্পর্কিত হাঙ্গামায় আহত দত্তোপাধিক জনৈক ব্রাহ্ম যুবককে তাহার 'মনু' নামক হিন্দু বন্ধু দেখিতে গেলে দত্তের মাতা মনুর নিকটে বলিয়াছিলেন—"আমাদের সমাজের ছেলেগুলি কি মানুষ বাবা, তারা কেবল মেয়েদের পোঁদে পোঁদে ঘুরতেই জানে!" মনীষী ৺বিপিনচন্দ্র পালও বোধ করি অনেক দুঃখেই বলিয়াছিলেন যে—"ব্রাহ্মের পক্ষে পুত্র-সন্তানের পিতা হওয়া পাপ।' বলা বাহুল্য—এহেন উক্তি কথনো ব্রাহ্ম

মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদেরই প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেক হিন্দু-যুবক ব্রাহ্ম পরিবারে যাতায়াত আরম্ভ করে—এমনকি বিবাহের গরজে ধর্ম্মান্তর পর্য্যন্ত গ্রহণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাবৃদ্ধি যে প্রধানতঃ এইভাবেই হইয়া থাকে, একথা অস্বীকার করা চলে না।

ইলা রায়+হিমাংশু গাঙ্গুলী

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় খড়দহের নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব। শিক্ষা দীক্ষায়, আভিজাত্যে বা সামাজিক মর্য্যাদায় খড়দহের গোস্বামী পরিবার যে বাংলার শীর্ষস্থানীয় তাহা না বলিলেও চলে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁহাদেরই নামানুসারে পরিচিত গোসাই-পাড়া লেনে বাস করেন। খড়দহেও তাঁহাদের বাড়ী জমিদারী এবং দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কলিকাতায় সহস্র সহস্র উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য তাঁহার শিষ্য।

মিস্ ইলার মাতা সরমাসুন্দরী প্রভুপাদ হরিশ্চন্দ্র গোস্বামীর মন্ত্র শিষ্যা। গোস্বামীজীর শিষ্যা তাঁহার কন্যা মিস্ ইলা রায়কে নিয়া এল্‌গিন্ রোডের একটী বাড়ীর ফ্লাট ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। ইলার বাবা মিঃ জে, রায় ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও খরচ তাহার কম ছিল না। কেবল সখের জন্য একবার বিলাত ভ্রমণ করিয়াই তিনি বিলাতী সমাজের হাল চাল ভাল রকমেই অবগত হইয়াছিলেন। তাই পত্নী ও একমাত্র কন্যাকে খাঁটি ইংরেজী ষ্টাইলে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি করেন নাই। এ কাযে দুই হাতে খরচ করিতে হয়। এই ভাবে খরচ করিয়া মিঃ রায় তাঁহার খিদিরপুরস্থ কারবারটীর অবস্থা এতই সঙ্গীন করিয়া তুলিলেন যে ৫৫ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিল, তখন বাঁচিয়া থাকিতেই স্ত্রী ও

কন্যার জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় করিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কারবারটা কর্ম্মচারীদের নিকট নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন।

মিঃ রায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রী সরমাসুন্দরী হিন্দু মতেই শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। প্রভুপাদ গোস্বামীজীর তত্ত্বাবধানে সংক্ষেপে কালিঘাটে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন হইল।

স্বামীর জীবন-ব্যাপী উপার্জ্জিত মোটা অর্থের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের অধিকারিণী হইলেও সেই ভগ্নাংশই দুটী প্রাণীর জীবন যাপনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু অর্থ চিন্তা না থাকিলেও মিসেস্ রায়ের মনে চিন্তার ও উদ্বেগের কম্‌তি ছিল না। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে—তাঁহার উদ্বেগের কারণ ছিল দুইটী। (১) বর্ত্তমান সমাজের অধোগামিতা হইতে যতদূর সম্ভব স্বতন্ত্র রাখিয়া কন্যাকে খাঁটি হিন্দুমতে মানুষ করিয়া তোলা (২) এবং উপার্জ্জনক্ষম যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া।

সুরমাসুন্দরী নিজে অবশ্য বিবাহের পরে স্বামী-গৃহে আসিয়া খাঁটি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চাল চলনে অভ্যস্থ হইয়াছিলেন ; কিন্তু মনে মনে ইহার আবিল কৃত্রিমতায় এই সমাজের উপরে বিতৃষ্ণ ছিলেন। তাই স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি কন্যাকে এই আবিলতা ও ইহার যে শোচনীয় পরিণাম তিনি স্বীয় সমাজের চারিদিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। কন্যার বয়স তখন দশ কি এগারোর অধিক হয় নাই ; তাই মনে করিলেন এই বয়স হইতেই তিনি কন্যাকে আভিলষিত পন্থায় গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

বিধবা হওয়ার পর সরমাসুন্দরীর অনুরোধে গোস্বামীজী ইলার খোঁজ খবর নিতে যাইতেন ; সরমাও মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ



শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

প্রণামী দিতেন। গোস্বামীজীও প্রণামীর আকর্ষণেই ইহাদের খোঁজ খবর লইতেন।

সরমাসুন্দরীর পিত্রালয় হাওড়ায়। পিত্রালয়ে তাঁহার একটী ভগ্নীপুত্র ছিল। ভগ্নী মারা যাওয়ার পরে ভগ্নীপতি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করিলে এই কিশোর বয়স্ক ভগ্নীপুত্র মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকে। এই ছেলেটী সচ্চরিত্র বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন। হিন্দু আদর্শে গঠিত ভ্রাতার সংস্পর্শে থাকিলে কন্যার উপকার হইবে মনে করিয়াও বটে এবং কেবলমাত্র দুইটী নারীর বন্ধনহীন জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব বলিয়াও বটে, তিনি হিমাংশুকে নিজের কাছে আনিবার সঙ্কল্প করিয়া গোস্বামীজীর পরামর্শ চাহিলেন। গোস্বামীজীর ইহাতে কোন আপত্তি হইল না। নিজের বোনপোকে রাখিতে অন্যের পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না, তবুও এখন তিনি গাস্বামীজীকে সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। হিমাংশুকে নিজের কাছে আনাইয়া লইলেন।

কিন্তু সংস্কার সাধনের এই কার্য্যে গোড়াতেই তিনি বাধা পাইলেন। স্বামী ইলাকে লরেটো গার্ল্‌স স্কুলে পড়িতে দিয়াছিলেন। ইলাকে লরেটো হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া বেলতলা স্কুলের প্রস্তাব করিতেই সে এমন বাঁকিয়া বসিল যে কিছুতেই তাহার মত পরিবর্ত্তন করা গেল না। গোসাইজী যাইয়াও তাহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। আদুরে মেয়ের আবদার বজায় রহিল। সে কেবল বলিল সঙ্গীণীদের ফেলিয়া অন্য স্কুলে যাইব না।

পরিবারের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন আনয়নে হিমাংশুর নিকট হইতে যতটা সাহায্য পাইবেন বলিয়া সরমা আশা করিয়াছিলেন, সে আশাও তাঁহার নির্ম্মূল হইল।

এদিকে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। ইলার বয়স বাড়িয়া চলিল। লরেটোতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছিল। বি এ পরীক্ষায় ফেল করিয়া হিমাংশুও ইতিমধ্যেই পড়াশুনা ছাড়িয়াছে। গোসাইজীকে বলিয়া ইলার মা হিমাংশুকে সেয়ার মার্কেটের এক দালালের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

হিমাংশু ইলাকে নিয়া খেলার মাঠে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে কিংবা পিকচার প্যালেসে ছবি দেখিয়া বেড়াইত। নিজেদের পাড়ার মধ্যেও ইলার বান্ধব বান্ধবীর অভাব ছিল না। তাহারা যেমন ইলার বাড়ীতে যাতায়াত করিত, ইলাও তেমনি তাহাদের বাড়ীতে রিটার্ণ ভিজিট্ দিত। তবে হিমাংশুকে ছাড়িয়া সে প্রায় কোথায়ও যাইত না। প্রথমাবস্থায় অবশ্য পাড়াগেঁয়ে বলিয়া হিমাংশুর উপরে শ্রদ্ধা ছিল না কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই হিমাংশু যে ভাবে সহরের আদব কায়দায় বিশেষতঃ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চাল-চলনে অভ্যস্থ হইয়া পড়িল এবং যেরূপ সত্বরতার সহিত মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিঃ চৌধুরীদের ঘরের খবর, শান্তি নিকেতনের থিয়াটারের নট নটীদের খবর, হকি ও ক্রিকেটের সংবাদ এবং হলিউডের রূপসীগণের ডাইভোর্স্ ও পুনর্ব্বিবাহের 'ফোরকাষ্টিং' বলিয়া যাইতে লাগিল, তাহাতে হিমাংশু কেবল ইলা নহে, তরুণ তরুণীদের অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া ফেলিল। গোঁসাইজী ইতিমধ্যে তাহার চাল-চলনে একটু বে-ফাঁস দেখিয়া সরমাকে আভাস দিয়া গেলেন। বোনপোর বিরুদ্ধে চট্ করিয়া কিছু বলাতো আর চলে না।

হিমাংশুর সঙ্গে ইলার শ্রদ্ধা যে ঘনিষ্টতায় পরিণত হইতে পারে তাহা ইলার মাতাও বুঝিতে পারেন নাই, গোসাইজী দূরে থাকিয়া আর কি

বুঝিবেন ! এই শ্রদ্ধা নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। একসঙ্গে ভ্রমণ, একত্রে বায়স্কোপ দেখা, পড়াশুনার ছলে ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাব্য ও আর্টের চর্চ্চা প্রভৃতি অবাধেই চলিতে লাগিল। কেবল ইহাই বা কেন ? বয়স্কা কুমারী কন্যাকেও পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে দিবার যে কুপ্রথা এদেশের ব্রাহ্ম এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজে বিদ্যমান, সেই কুপ্রথা স্বামী বর্ত্তমানে সরমা নিজেই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরে বাধা দিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। এস্থলেও সেই কুপ্রথা আরও অধিক দূর অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিল না, এমন কথা কে বলিতে পারে ?

ইলার বয়স যখন যোল বৎসর তখন তাহার প্রতিবেশিনী শ্রীমতী রেবা রায় ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটে সাগর-নৃত্য দেখাইয়া কলিকাতার তরুণ দলকে মাতাইয়া দিয়াছেন। ইলা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার হিমাংশুর সঙ্গে এম্পায়ার থিয়েটারে যাইয়া রবীন্দ্রনাথের পরিচালিত শান্তি-নিকেতনের ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেল্ ডেন্সিং দেখিয়া আসিয়াছে। এইরূপ নৃত্য শিখিবার বাসনা ইলার মনে উদিত হইল। সে মা'র কাছে আবদার ধরিল—বোলপুরে গিয়া শান্তি নিকেতনে পড়িবে। ইলার মা গোসাইজীকে ডাকিলেন। গোসাইজী শান্তিনিকেতনে হিন্দুর মেয়ের পরিণামের বিষয় আমূল বিবৃত করিলেন। ইলার মা ইলাকে এসব কিছু বলিলেন না। একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না—কন্যাকে ইহাই বুঝাইলেন। বোলপুরে পড়িবার কথাটা এইখানেই ধামা চাপা পড়িল। কন্যার আগ্রহাতিশয্যে ও হিমাংশুর অনুরোধে মাতা তাহাকে নাচ্ শিখাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

প্রথমে কথা উঠিল ইলা শ্রীমতী রেবা রায়ের কাছে যাইয়া নাচ

শিখিবে। ইলার মাতা রেবা রায়দের জানিতেন না, ওখানে তাঁহার মত ছিল না, এ প্রস্তাবও বাতিল হইল। অবশেষে ঠিক হইল বাড়ীতেই নাচ শিখিবে, কোন শিক্ষয়িত্রী শিখাইবেন। মিস্ ইসাবেল্ নাম্নী এক নর্ত্তকী ইলাকে ওরিয়েণ্টাল ডান্স্ শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হইলেন। উৎসাহের সহিত নাচ শিখিয়া অল্প দিনের মধ্যে ইলা প্রাচ্য নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করিল। এস্থলে ইহা লক্ষ করিবার যে নিজের মত না থাকিলেও মাতা কন্যার আগ্রহাতিশয্য ও হিমাংশুর অনুরোধে এই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইলা নাচ শিখিল বটে কিন্তু কোন প্রকাশ্য নাচের আসরে বিদ্যার পরিচয় দিতে না পারিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কৃতিপুত্র মিঃ কুনাল সেন, মিসেস্ সেন, এমেচার নৃত্যশিল্পি মিঃ মধু বোস্ প্রভৃতির সহায়তায় একটী থিয়েটার পার্টি খুলিয়া এম্পায়ার থিয়েটারে আলিবাবা নাটকের অভিনয় করিতেছিলেন। মিসেস্ রায় বোধ হয় ইহাদের সংশ্রবে চলিতে চাহিতেন না বলিয়া আগ্রহ থাকিলেও ইলা এই পার্টিতে যোগ দিতে পারিল না। এম্পায়ার থিয়েটারে আসিয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে সে বলিল—মিঃ বোস্ আর তাঁর cousin sister কেমন আব্দালা ও মর্জ্জিনার পাঠ কর্চ্ছে। তুমি যদি নাচ শিখতে, তাহ'লে আমরা এমনি একটা পার্টি ফর্ম্ করতে পারতাম। মাকে ধরলে তিনি টাকা না দিয়ে কি পারতেন?

কুমার গোপীকারমণ রায়ের স্ত্রী কন্যাগণ নৃত্যাভিনয়ে বিশেষ দক্ষ, নাচগান তাঁহার নিজ বাড়ীতেই হয়, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেই সব দিক রক্ষা করিয়া চলা যাইবে—এই ভাবিয়া একদিন হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়া ইলা সেখানে গেলেন। সেখানে অনেক মহিলার সঙ্গে তাঁহার

সাক্ষাৎ হইল। ঐ মহিলারা অনেক অনুরোধ করায় সে একটীবার নাচিবার পর কুমার বাহাদুরের জনৈক পারিষদ একটা সিল্কের কাঁচলি ইলার হাতে দিয়া বলিলেন যে ব্লাউজের উপর এই কাঁচলি পরিয়া নাচিলে আপনাকে মানাবে ভাল। ব্যাপারটা ইলার চক্ষে ভাল লাগিল না, সেখানকার চাল চলন পছন্দ না হওয়ায় হিমাংশুকে নিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

এখন হইতে রোজ সে ঘরেই একলাটী নাচে, হিমাংশু দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

এইভাবে বৎসর খানেক চলিল। একদিন ইলা হিমাংশুকে বলিল—মিঃ বোস্ তার cousinকে বিয়ে করে আব্দালা ও মর্জ্জিনার পাকা মিলন ঘটিয়েছে। তুমি বলতো আমি মাসীমার কাছে প্রপোজ করে দেখি।

এ প্রস্তাবে ইলা আকাশ হইতে পড়িল। বন্ধু হিসাবেই সে এতদিন হিমাংশুকে ভাল বাসিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলে বিবাহ! ইলাদের সমাজের মেয়েদের কাছে সেই প্রেম একেবারেই অপরিজ্ঞাত, যে প্রেম দীন দরিদ্রকেও জীবন-সঙ্গীরূপে বরণ করিতে শিক্ষা দেয়। সে শুধু বলিল—তুমি পাগল হয়েছ হিমাংশুদা। নানাদিক বিবেচনা করিয়া হিমাংশুও আর উচ্চ বাচ্চ করিল না। কেবল এই আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

ইলার বিবাহ দিবার জন্য ইলার মা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একটী ভাল ছেলে জোগাড় করিতে তিনি গোসাইজীকে অনুরোধ করিলেন। গোসইজী বলিলেন, এ মেয়ের পাত্র আমার সন্ধানে নাই, আর আমি জোগাড় করিলেও তাহা ইলার পছন্দ হবে বলে মনে

হয় না। ইলার মা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন, তা'হলে আমার আর কে সাহায্য করিবে! গোসাইজী নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন, এ মেয়ের বর নিজেই ঠিক করে নিবে, আপনার ভাবতে হবে না। গোসাইজী সেকালের মা-গোসাই নহেন, তিনি ইলার অনেক খবর রাখিতেন। তবুও দুই একটী ভাল ছেলের খবর যে গোসাইজী না দিয়াছিলেন তাহাও নয়। ইলার মার মত হইলেও ইলা সেই সকল প্রস্তাবে কাণ দেয় নাই—গোসাইজীও এ সম্বন্ধে আর চেষ্টা করেন নাই।

হিলাংশুকে তার মাসী একটী ভাল ছেলের চেষ্টা করিতে বলিলেন—হিমাংশু সে-অঞ্চলের যত তার বয়াটে বন্ধুকে বাসায় আনিয়া নিত্য নূতন পার্টি, নিত্য নূতন গানের আসর বসাইতে লাগিল। আগন্তুক যুবকগণের একটীকেও মিসেস্ রায়ের পছন্দ হইল না। আর ইলাও একআধটি গান গাহিয়া, কোনদিন বা বিশেষ অনুরোধে একটু নাচ দেখাইয়া লুব্ধ যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কাহারও কাছে ধরা দিল না।

এই সময়ে সঙ্গীত সম্মিলনীর উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে যে জল্‌সা হয় ইলা তাহাতে যোগদান করিয়াছিল। রেবা রায়ের তখন খুবই নাম ডাক। তাঁহার সাগর-নৃত্যের দোলায় কলিকাতায় অধিকাংশ যুবকের চিত্ত দোলায়মান। ইলা রেবা রায়ের প্রশংসায় খুব ঈর্ষান্বিত ছিল কিন্তু তাহার যোগ্যতা দেখাইবার কোন সুযোগ ঘটিতেছিলনা।

যে ভাবেই হউক ইলাকে যে-কোন একটী যুবকের সঙ্গে জুটাইয়া দিবার জন্য হিমাংশু কৃতসঙ্কল্প ছিল। তাহার আনীত যুবকগণের কাহাকেও আমল না দিলেও হিমাংশু দমিয়া গেল না। মিঃ ডিঃ লাহিড়ী নামক হিমাংশুর একটী বন্ধু ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাতে গিয়াছিল। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় ফেল করিয়া মাইনিং এর একটা সার্টিফিকেট লইয়া তিনি দেশে

ফিরিয়াছিলেন। মিঃ লাহিড়ীর বাবার ছোট নাগপুর অঞ্চলে কয়লার একটা ছোট খনি আছে—লাহিড়ী পরিবার কোন কোন সময়ে সেই দিকেই বাস করিতেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মিঃ লাহিড়ী কয়েক মাসের জন্ত কলিকাতায় আসিয়া ল্যান্সডাউন রোডে একটী বাসা ভাড়া লইলেন। বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কাজ ছিল না, সন্ত বিলাত ফেরতের গৌরব ও চূড়ান্ত সাহেবিয়ানা প্রদর্শনই ছিল তাঁহার এই অস্থায়ী কলিকাতা বাসের উদ্দেশ্ত। হিমাংশুর সাহায্যে মিঃ লাহিড়ী বল্‌-ডেন্সিং পার্টির আয়োজন আরম্ভ করিলেন। নিমন্ত্রণ বেশী কাহাকেও করা হইল না, কয়েকজন ফিরিঙ্গী যুবক যুবতীকেও নাচিতে আহ্বান করা হইয়াছিল, আর যাহারা নাচিবেন তাঁহারা আসিলেন।

ইলা এই পার্টিতে যোগ দিল। হিমাংশুর প্রস্তাবে ইলা মিঃ লাহিড়ীর নৃত্য-সঙ্গিনী হইল। বল্‌-রুম নাচ চলিতেছে। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের নর নারীগণ উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। নানা আকারে নানা ভঙ্গিতে নর নারীর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা মাত্র। মিঃ লাহিড়ী একটু হুইস্কি টানিয়া যখন আবার নাচের আসরে নামিলেন তখন নাচে জমাট বাঁধিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ মহিলাদের মধ্যে যে কেহই মদ খান নাই তাহা বলা যায় না।

বাড়ী ফিরিবার পথে হিমাংশুর মুখেও মদের গন্ধ পাওয়া গেল। ইহার পর হইতে ইলাদের গৃহে মিঃ লাহিড়ীর ঘন ঘন যাতায়াত সুরু হইল। ইলার মা অনন্যোপায় হইয়াই হউক বা যে কারণেই হউক মিঃ লাহিড়ীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। যখন জানিতে পারিলেন লাহিড়ী তাঁহার পিত্রালয়ের দেশীয় লোক এবং লাহিড়ীর বাবা নিষ্ঠাবান হিন্দু তখন তাঁহার গৃহে লাহিড়ীর খাতিরের আর অন্ত রহিল

না। ইলা কখনও নাচে, কখনও গানে লাহিড়ীকে খুসী করিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যায় লাহিড়ী, হিমাংশু আর ইলা মোটরে বেড়াইতে বাহির হইত।

এইভাবে কয়েকমাস চলিল। লাহিড়ী একদিন ইলার মাতাকে বলিলেন—তাঁহার এখন কিছুদিনের জন্য খনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন ইলার মা তাঁহার সঙ্গে ইলার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে লাহিড়ী এমন উৎসাহ দেখাইলেন যেন এ বিবাহের কথা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। বাস্তবিক পক্ষে ইলার সঙ্গে নাকি এ-প্রকার স্থির করিয়াই বন্ধুত্বটা পাকা করিয়াছিলেন। ইহার দিন তিনেক পরেই লাহিড়ী কলিকাতার পাট তুলিয়া চলিয়া গেলেন; পুনঃ পুনঃ চিঠি পত্র লিখিয়াও ইলার মা আর তাঁহার উত্তর পাইলেন না। অবশেষে কন্যা দ্বারাও চিঠি লেখাইলেন কিন্তু তাহারও উত্তর নাই।

লাহিড়ীর এ ব্যবহারে ইলা একটু মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার ন্যায় অগ্রগামিনী নারী এরূপ তুচ্ছ ব্যপার লইয়া নিজকে বেশী ব্যতিব্যস্ত করিতে পারেনা। সে জোর করিয়াই লাহিড়ীর চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

লাহিড়ীর আচরণ স্বীয় সমাজের উপরে মিসেস্ রায়ের মন একেবারেই বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। এল্‌গিন রোডের বাসা ছাড়িয়া দিয়া তিনি চক্রবেড়েতে গিয়া বাসা বাঁধিলেন এবং ইলার জন্য সাত্ত্বিক গোছের একটী পাত্রের খোঁজ করিতে লাগিলেন। আবার গোস্বামিজীকে ডাকিয়া সকল বিষয় বলিলেন। গোসাইজী তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তাঁহা দ্বারা এ পাত্র ঠিক করা সম্ভব নহে।

হিমাংশু তাহার মাসীকে বুঝাইল যে খাঁটি হিন্দু পাত্রই জুটিয়া যাইবে



শ্রীমতী অরুণা গাঙ্গুলী

কিন্তু মেয়েকে বাড়ী বসাইয়া রাখিয়া তার পছন্দ মত পাত্র জোটান স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও অসাধ্য। মাসী যে হিমাংশুর কথাটা না বুঝিয়াছিলেন তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহারা নাচ গানে অভিপ্সাত বর জোটাইয়া বিবাহ করিয়াছে তাহাদের দশ বারটা নাম করিয়া ফেলিল। রায় গৃহিণী শুধু বলিলেন—যা ভাল বোঝ কর বাছা। কেবল কোন দাঁড়কাক সাহেব এনে হাজির করোনা।

শ্রীমতী বিজলী সেন নাম্নী একটী বালিকার সহিত ঠাকুর বাড়ীর অভিনয় দেখিতে গিয়া ইলার আলাপ হইয়াছিল। এই বিজলীর সহিত ইলা নারী নৃত্যের এক আস্তানায় গেল। ইহা ধর্ম্মতলার উপর নাড়াজোলের রাজার এক ভাড়াটে বাড়ী, সেখানে মহলা হয়। এই নৃত্যসমিতির মালিক তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কয়েকদিন মধ্যেই ভর্ত্তি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইলা প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। নৃত্যাভিনয় শিক্ষা করিবার জন্য ভদ্রঘরের কতকগুলি শিক্ষিত যুবকও সেখানে যাইত। দুই তিন দিন যাতায়াতের পর অরুণপ্রকাশ নামক একটী প্রিয়দর্শন যুবকের সহিত ইলার আলাপ হইল। হিমাংশু ইহাদের কথা কতকটা আন্দাজ করিতে পারিয়া একদিন অরুণপ্রকাশকে সান্ধ্য চা পানের নিমন্ত্রণ করিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অরুণপ্রকাশ যথাসময়ে ইলাদের বাড়ী হাজির হইল। নিজ বন্ধু বলিয়া হিমাংশু তাহাকে ইলার মার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। বাজার হইতে খাবার আনাইয়া মাটীতে আসন বিছাইয়া বসাইয়া ইলার মা স্বহস্তে অরুণপ্রকাশকে খাওয়াইলেন। গরদের জামা চাদর পরা সুশ্রী যুবকটীকে রায়-গৃহিণীর ভাল লাগিয়াছিল। অরুণ

চলিয়া গেলে একখানা দশ টাকার নোট মাথায় ঠেকাইয়া তিনি দেরাজের একটী কোণে পুরিয়া রাখিলেন—অরুণকে জামাইরূপে পাইলে তিনি ঐ টাকায় কালীঘাটে কালীমাতাকে পূজা দিয়া আসিবেন। হিমাংশুকে ডাকিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন এবং সোয়া পাঁচ আনা দিয়া ঐ দিনই কালীকে পূজা দিতে পাঠাইয়া দিলেন।

চক্রবেড়ে আসিবার পর হইতে মিসেস্ রায় মাঝে মাঝে কালী গঙ্গায় গিয়া স্নান ও কালী মন্দিরে ডালি দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোসাইজী কৃষ্ণ ভক্ত হইলেও তিনি খুব উদার, তাঁহারই উপদেশ মত মিসেস্ রায় কালী গঙ্গার অপরিস্কৃত জলে স্নান করিতেন। গোসাইজী মিসেস্ রায়কে বলিয়াছিলেন যে মেয়ের উপযুক্ত বর জোটাইবার ভার মা কালীর, তাঁরই কাছে আবেদন নিবেদন করিবেন। ইলাকেও তাহার মা একদিন কালী গঙ্গায় স্নান করাইতে নিয়া যান কিন্তু প্রকাশ্য ঘাটে এত পুরুষের চক্ষের উপর, এমন অপরিস্কৃত জলে সে স্নান করিতে পারিবে না বলিয়া বসিল। মাতার সঙ্গে যাইয়া কালীর নিকট মাথা নত করিয়া দুই হস্ত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়াছিল। তবে মাতা এবং হিমাংশুর অনুরোধেও মা কালীর অপরিস্কৃত চরণামৃত গ্রহণ করে নাই।

এ বাসায় অরুণপ্রকাশের ঘন ঘন নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। অরুণ প্রকাশ মিসেস্ রায়ের নিজ হস্তে রান্নার খুব প্রশংসা করিত। এ বাড়ীতে অরুণের এক প্রকার স্থায়ী প্রবেশাধিকার জন্মিল বলিলেও চলে।

এই ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ইলা বা অরুণ বিবাহের নামও করে না। কিন্তু এক বৎসরে ইলার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দেখিয়া ইলার মাতা খুসী হইলেন। ইলা এখন আর এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না, বন্ধু বান্ধবের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। মাত্র অরুণ

ব্যতীত বাহিরের আর কাহারও সঙ্গে মোটরে বাহির হয় না। অরুণ ব্যতীত অন্য কোন যুবকের সঙ্গে বড় একটা মিশিতে দেখা যায় না। ইলার মা একদিন অরুণের কাছে ইলার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। অরুণ সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ইলার মাতার শ্রদ্ধা তাহার প্রতি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ইতিমধ্যে ইলার মাঝে মাঝে মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, কখনও বা হাত পা জ্বালা করে। ইলার মা'র পিত্তের বেদনা ছিল; কন্যারও হয়ত ঐ রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ ভাবিয়া গোসাইজীকে ডাক্তার আনিতে খবর দিলেন। গোসাইজী ডাক্তার সহ ইলাদের বাড়ী গেলেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দে গোসাইজীর বিশেষ বন্ধু, এই ডাক্তার বাবু রোগিণীর অবস্থা শুনিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার পর ডাক্তার বাবু দুই চোখ কপালে তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না। গোসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রোগ ডাক্তার বাবু? ডাক্তার বাবু রোগিণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য ঘরে যাইয়া গোসাইজীর নিকট রোগের বিষয় বলিলেন। গোসাইজী আর কি করিবেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ইলার মাকে এ বিষয় বলিতে হইল। ইলার মাও এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন—তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন হিমাংশুকে ডাকিয়া অরুণের সঙ্গে সপ্তাহ মধ্যে বিবাহ সম্পাদন করিতে বলিলেন।

অরুণপ্রকাশ পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে ইলার কি রোগ। ইলাই তাকে প্রথম বলে। বিবাহের নামে অরুণপ্রকাশ মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে তো বিবাহ করিবার জন্য এ বাড়ী যাতায়াত করে নাই। এ বিবাহ করিলে

পিতা কর্ত্তৃক ত্যজ্য হইবে, মা ভাই বোন সকলকে ছাড়িতে হইবে, একটা বিবাহের খাতিরে সে এত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। নর পশুটা দুই একদিন মধ্যেই গা ঢাকা দিল।

এখন উপায় কি! হিমাংশু ডাক্তারের নিকট আসিল ইহার একটা 'গতি' করিবার জন্য। ডাক্তারবাবু প্রস্তাব শুনিবামাত্রই চটিয়া লাল হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ গর্ভ যদি কোন প্রকারে নষ্ট হয় তবে তিনিই পুলিশে ধরাইয়া দিবেন—ইহাও বলিয়া দিলেন।

হিমাংশু বাড়ী আসিয়া মাসীমাকে সব কথা বলিল। মাসীমা শুনিয়া অর্দ্ধ-চৈতন্য হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইলা অন্য ঘরে থাকিয়া সব কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। হিমাংশু মাসীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু সে কি সান্ত্বনা দিতে পারে! মাসী তখনও জানেন বোনপো নিষ্পাপ। হিমাংশু ইলাকে বলিল—তোকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবার ভার আমি নিলাম। তোর আর মাসীমার জন্য একলঙ্ক, অরুণের ভাবি সন্তানের পিতৃত্ব সবই আমি স্বীকার করে নেবো।

এদিকে তো সব ঠিক কিন্তু মাসীর কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার মত সাহস দুজনের কাহারও হইল না। কথা প্রসঙ্গে একদিন হিমাংশু মাসীকে বলিল, এখনতো কাজিন বিবাহটা একরকম চলেই গেছে। স্যার কে জি গুপ্তের কন্যাকে তাঁর ভাগিনেয় বিবাহ করিয়াছিলেন বহু পুর্ব্বে, সেদিন এইচ্ গুপ্তের কন্যাকে তাঁহার আপন শালির ছেলে বিবাহ করিয়াছে। এমনি আরও পাঁচ সাতটা এমন নাম সে করিল যাদের কথা মাসী পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলেন।

মাসী একটু ভাবিয়া বলিলেন, একলঙ্ক নিয়ে কেউকি বিয়ে করবে?

আর আমার কেইবা আছে! যদি জোটে তবুও মেয়ের মন উঠ্‌লে হয়। হিমাংশু বলিল তুমি যদি মত কর মাসীমা তবে তোমাদের জন্য একলক্ষ আমি মাথায় নিতে প্রস্তুত। আর ইলারও বোধ হয় অমত হবে না।

হিমাংশু বাড়ীতেই থাকে সুতরাং লোকের সন্দেহে তেমন দোষ হবে না। ইহার পরদিনই তাঁহারা দমদমার এক বাগান বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে হিমাংশু মাসীকে বলিল—বিয়েতো করবো কিন্তু খাওয়াব কি মাসীমা? এ ভারও মাসী বহন করিবেন বলিয়া তাকে আশ্বস্ত করিতে চাহিলেন কিন্তু সে বলিল—স্ত্রীর অন্নদাস হয়ে থাকাটা কি ভাল দেখাবে মাসী মা?

এই ভাবে বিবাহের পূর্ব্বে সে দশ হাজার টাকার এক চেক আদায় করিয়া এক রাত্রে বাগান বাড়ীতেই মাত্র শাঁক বাজাইয়া শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিল।

বিবাহের পর ইলা ক্রমে আসন্নপ্রসবা হইলেন। তাহাকে নিয়া বেড়ান বা নাচ গান চলে না, বিবাহ করিল বটে কিন্তু তার মন উঠিল না। যথা সময়ে ইলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল।

হিমাংশু ইহার পর হইতে রায় পরিবারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকে, ইলার মা অনেক খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান পাইলেন না। তাঁহারা যখন হিমাংশুর ব্যবহারটা বুঝিলেন তখন আর খোঁজ করিবার আবশ্যক মনে করিলেন না।

প্রায় দেড় বৎসর পর ইলার মা হিমাংশুর খোঁজ পাইলেন। হিমাংশু আবার বিবাহ করিয়াছে এবং একটী কন্যাও হইয়াছে।

হিমাংশু কি করিয়া যে রায় পরিবারের মাথায় হাত বুলাইয়া টাকাটা আদায় করিয়াছে তাহা বন্ধুদের নিকট বলিতেও সে লজ্জিত হয় না।

ইলা ও তাহার মা এখনও ভবানীপুরে আছেন। ইলাও এখন মাতার ন্যায় হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

অনিসন্ধিৎসু পাঠক এই বিবাহের আদ্যান্ত খবর প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ইচ্ছা করিলে জানিতে পারিবেন। আমরা তাঁহার নিকট জানিয়া এই ইতিহাস মুদ্রিত করিলাম।

আশালতা সেন + কাজি নজরুল ইস্‌লাম

"বল বীর,
চির উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নতশির ঐ
শিখর হিমাদ্রির।
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ব-বিধাতৃর।"

* * * * *

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন!"

* * * * *

"আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল-কন্যা"

ভাবের ঘোরে কবি অনেক সময় অনেক স্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্ন প্রায়শঃ মানুষের স্বাভাবিক অবস্থাকে, মানুষের সাধ্য ও :শক্তির গণ্ডীকে ছাড়াইয়া যায়। কবি-চিত্ত বল্‌গা-বিহীন তুরগের ন্যায় উদ্দাম বলিয়াই মানুষ তাহাতে আপত্তি করে না। বরং বাস্তব-জগতের ক্লান্তি ও অবসাদকে দূর করিবার জন্য আপনার সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ মনকে কিছুকালের জন্য কবির সহিত কল্পনার রাজ্যে ছুটাইয়া দেয়। তারপর আবার আপনাতে আপনি ফিরিয়া আইসে। সে স্বীকার করে—কবি-চিত্তের গতি সর্ব্বদাই সোজা একটানা পথে। অসম্ভবের বাধা ও দুর্লঙ্ঘ্যতার বিঘ্নকে গ্রাহ্য করা কবির স্বভাব নয়।

কিন্তু তাই বলিয়া তরুণ বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের মত ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদ করিয়া খোদার আসনকে নীচে ফেলিয়া রাখিয়া বিশ্ব-বিধাতৃর বিস্ময় হইয়া আর কোন কবি এত উচ্চে উঠিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন? ভগবানের বুকে পদচিহ্ন আঁকিয়া দিবার মত, বিধির বক্ষ ভিন্ন করিবার মত দুঃসাহসী আর কোন কবি হইয়াছেন?

নারী-সঙ্গ কামনা কবির বৈশিষ্ট। সেই কামনায় কবি কখনও বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া শকুন্তলার আলবোলার সাহায্যে তপোবনের বৃক্ষ-চারায় জল-সিঞ্চন দেখিয়াছেন, কখনও বা বিরহী প্রিয়ের বার্ত্তা লইয়া মেঘের সঙ্গে উড়িয়া চলিয়াছেন, কখনও প্রেমিক রোমিওর সঙ্গে প্রেমিকা জুলিয়েটের অধর চুম্বন করিয়া বিষ-জ্বালা অনুভব করিয়াছেন, কখনও বা মোয়াজ্জিনের আয়জান উপেক্ষা করিয়া শাকীর পরিবেশিত সুরার রঙে নিজেকে রঙ্গীন্ করিয়া তুলিতেছেন! কিন্তু বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল-কন্যা ছিনাইয়া আনিবার এ দুশ্চেষ্টা আর কোন কবির হইয়াছে?

এই দুঃসাহসিকতা এই অকুতোভয়তা, এই নাস্তিকতা, উদ্দাম ভাব-

প্রবণতা কবি নজরুল ইস্‌লামের রচনার বৈশিষ্ট্য। কবির বাক্যে ও জীবনে ঐক্য থাকে না; তাহা থাকিলে ইহা যে তাঁহার জীবনেরও বৈশিষ্ট্য, একথাও স্বীকার করিতে হইবে।

কাজি নজরুল ইস্‌লামের পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জিলার চুড়ুলিয়া গ্রামে। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান নহেন; কয়েকটী পুত্রের অন্যতম। স্কুলে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে এদেশে যখন সৈন্য সংগ্রহ করা হয়, তখন তিনি ভারতীয় পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়া নজরুল "হাবিলদার" পদ প্রাপ্ত হ'ন।

যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে কিশোর বয়স হইতেই নজরুল কবিতা লিখিতেন। প্রবাসী, বিজয়া, যমুনা ভারতী পত্রে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। যুদ্ধে গিয়া মেসোপটোমিয়ার ক্যাম্পে বসিয়া তিনি 'ব্যথার দান' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন।

মহাযুদ্ধের অবসানে নজরুল যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু ও গুণমুগ্ধগণের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইঁহারা তাঁহাকে সৈনিক-কবি বলিয়া আখ্যাত করিতেন। মাসিকপত্র সমূহের পাঠকেরাও তখন "সৈনিক-কবি" বলিলে হাবিলদার নজরুল ইস্‌লামকে চিনিতে পারিতেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি মোস্‌লেম সাহিত্য-সমিতিতে যোগদান করেন। এই সময় ঢাকার ভারতী লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মোস্‌লেম সমাজের উদীয়মান সাহিত্যিক মোহাম্মদ আলি আকবর খান বি এ'র সহিত তিনি পরিচিত হ'ন। আলি আকবর সাহেব পূর্ব্বেই নজরুলের কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সাক্ষাৎ পরিচয়েও কবিকে তাঁহার ভাল লাগিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। আলি সাহেব বন্ধুকে কুমিল্লায় তাঁহার নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

কাজীও কলিকাতায় তেমন কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন না। বন্ধুর সঙ্গে তিনি কুমিল্লায় চলিয়া গেলেন।

সকলেই জানেন, নজরুল ইস্‌লাম কেবল কবি নহেন, তিনি একজন সুগায়ক। আজকাল তিনি প্রধাণতঃ গীতি-রচয়িতা ও সুর-সংযোজয়িতা বলিয়াই সর্ব্বত্র সমাদৃত। কিন্তু তরুণ যুবক নজরুল তখন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁহার গানের মোহিণী শক্তিতে তখন লোক এতই মুগ্ধ হইত যে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই গান শুনিয়া সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। নজরুলকে যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন, তাহারা একথাও মানিবেন যে একমাত্র গান দিয়াই তিনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। একে তিনি কবি, তাহার উপরে আবার মোস্লেম ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দু পুরাণ উভয়েই তাঁহার দখল আছে। কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াও উভয় ভাবই তাঁহার মধ্যে এমন সুন্দররূপে ফুটিয়া ওঠে যে হিন্দুরা তাহাকে ঠিক হিন্দু এবং মুসলমানেরা মুসলমান বলিয়া ধরিয়া লন। ইহা ছাড় তাঁহার ন্যায় মিষ্টালাপী খুবই কম আছে; যে আসরে বসেন সেই আসরই শ্রুতি সুখকর রসপূর্ণ গল্পে মাতাইয়া তোলেন। সভায় দাঁড়াইয়া বজ্র-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে, বিদ্বৎসমাজে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে, ক্লাবে বা আখ্‌ড়ায় সময়োচিত হাস্য পরিহাস করিতে এবং নারী-জন-মধ্যে মন-মুগ্ধকর মধুরালাপ করিতে ইনি সমভাবে পটু। তাঁহার বলিষ্ঠ অথচ সুকোমল বপু, সুন্দর চক্ষু দু'টী, অকপট ও সরল সু-উচ্চ হাস্যধ্বনি এবং গোলগাল মুখটীর উপরিভাগে অযত্ন-সঞ্চিত অথচ সুবিন্যস্ত রুক্ষণ অথচ কুঞ্চিত কেশপাশও কম আকর্ষণের নহে। দূরে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে যে-ধারণাই পোষণ করুক, কাছে আসিলে—দু'দণ্ড আলাপ করিলে দুইটী ঘণ্টা তাঁহার সহিত মিশিলে আর তাঁহার প্রতি বিরূপ থাকিতে পারিবেনা, ইহা নিশ্চিত। একথা যেমন আমরা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের কাছে শুনিয়াছি,তেমন তাঁহার জীবনের বহু ঘটনায়ও প্রতিভাত দেখিতে পাইয়েছি।

কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে সদর ও অন্দরের পার্থক্য থাকিতে পারে না। কবি, শিল্পী, সুগায়ক, লোক-শিক্ষক বা ধার্ম্মিক সাধু-সজ্জন—ইঁহাদের লোক সর্ব্বসাধারণের বলিয়া জানে। তাই সদর ও অন্দর উভয়ই ইঁহাদের উপরে সমান দাবী রাখে। বিশেষতঃ গায়ক যদি সুগায়ক হয়, তাহা হইলে অন্দরের দরজা তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইবেই হইবে।

সঙ্গীতের জন্য কবি নজরুলের যে কত খাতির, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার যখন কৃষক আন্দোলন উপলক্ষে সহর ও মফঃস্বলের নানাস্থানে বক্তৃতা করিতে যাইতেন, নজরুলকেও তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন সভায় গান গাহিবার ও বক্তৃতার জন্য। হেমন্তবাবুর মুখেই শুনিয়াছি যে, সভায় নজরুলের দুই একখানা গান শুনিয়া লোকের তৃপ্তি হইতনা, তাঁহাকে পর পর অনেকগুলি গান গাহিতে হইত। গানে মুগ্ধ হইয়া অনেক ভদ্রলোক কাজিকে বাসায় লইয়া যাইতেন মেয়েদের গান শুনাইবার জন্য। এই প্রসঙ্গে হেমন্তবাবু বলিয়াছেন—"অনেক হিন্দু বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রিত হইতাম। আমাকে বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া বাড়ীর লোকেরা প্রায়শঃ অপরিচিত মুসলমান যুবক কাজীকে মহিলাদের গান শুনিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে একা বসিয়া থাকিতে আমি বিরক্তি বোধ করিতাম আর কাজী হয়তো ততক্ষণে আসর বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাজীকে মহিলাগণ ভিতরে জলযোগে আপ্যায়িত করিতেন আর আমার জলখাবার বাহির্ব্বাটীতে প্রেরিত হইত।"

যদিও হিন্দুগণের ন্যায় এতাদৃশ উদারতা মুসলমানগণ আজিও প্রাপ্ত হ'ন নাই, তথাপি কুমিল্লায় আলি আকবর সাহেবের শিক্ষিত পরিবারে কাজী নজরুলের বেশ প্রতিষ্ঠা হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ পরিবার মধ্যে

আলি সাহেবের এক কুমারী ভাগিনেয়ী ছিলেন। ইনি যেমন সুন্দরী, তেমনি শিক্ষিতা ও সুশীলা। নজরুলের কবিত্ব ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া এই তরুণীটী অল্প দিনেই তাঁহার ভক্ত হইয়া ওঠেন। কবিও পবিত্র প্রসন্নতার সহিত ইঁহার ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেন।

আলি সাহেব কাজীর সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; কাজী এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিলেন। আলি সাহেবের বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে কাজীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অন্যের অজ্ঞাত কোন বিশেষ কারণে কাজী আলি সাহেবের পল্লী-গ্রামস্থ গৃহ হইতে না বলিয়া কুমিল্লা সহরে শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ সেন নামক এক বৈদ্য ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। শুনা যায়, আলি সাহেব আর ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেন নাই। জ্ঞানচর্চ্চা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য অদ্যাবধি তিনি মাতুলের ঢাকার বাসায় বাস করিতেছেন। সম্পত্তির তত্ত্বাবধান জন্য অনেক সময় মাতুলানী পল্লী গ্রামস্থ গৃহে থাকেন, এজন্য ঢাকার ঘর-সংসারের ও মাতুলের সমুদয় কাজই তাঁহার করিতে হয়।

ইহার পূর্ব্বে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে নজরুল আর একবার কুমিল্লা গিয়াছিলেন। বীরেনবাবুর সঙ্গে সেই সময় তাঁহার আলাপ হয়। সেবার তিনি বীরেনবাবুদের একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম্ সারাইয়া দেন। পরে বীরেনবাবুর অনুরোধে ঐ হারমোনিয়ামের সাহায্যে তাঁহার পরিবারস্থ মেয়েদের গান শিখান।

এই প্রসঙ্গে সেন-পরিবারের কিছু পরিচয় প্রদান করিলে তাহা বাহুল্য বিবেচিত হইবে না। ইঁহাদের আদিম নিবাস ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে। তেওতার বিখ্যাত জমীদার রায়-গোষ্ঠি ইঁহাদের দূর আত্মীয়। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে এই পরিবার কুমিল্লায় বাস করেন।

যাহাহৌক্ কাজী যখন আলি সাহেবের পল্লীগ্রামস্থ বাড়ী হইতে গা ঢাকা দিয়া কুমিল্লা সহরে সেন-পরিবারে গিয়া উঠেন, পরিবারস্থ সকলেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কাজীর গানে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা মুগ্ধ, এবারে সেইগান প্রাণ ভরিয়া শুনিতে পারিবেন। কাজী যে মুসলমান, একথা পরিবারস্থ কাহারও মনে রহিল না। মনে থাকিবেই বা কেন? কবিত্ব-মাধুর্য্যের জন্য কবি সকলেরই প্রিয়—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই কবি আপনার জন। বিশ্ব-মানব সকলেরই কবির উপরে দাবী। তাহা ছাড়া তিনি আবার সুকণ্ঠ সুগায়ক। সুকণ্ঠ পাখীর গান শুনিয়া মানুষ যখন মুগ্ধ হয়, তখন পাখীকে পাখী বলিয়া বোধ থাকে না। সেন-পরিবারেও তাহাই হইল। একসঙ্গে আহার বিহার চলিতে লাগিল। তবে রান্না ঘরে তিনি প্রবেশ করিতেন না।

এই পরিবারে কয়েকদিন বাস করিবার পরে কাজী জ্বরে আক্রান্ত হ'ন। জ্বর ক্রমেই বাড়িয়া ওঠে। বীরেনবাবুর মাতাকে কাজী মাতৃ-সম্বোধন করিতেন, তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহে শুশ্রূষা করেন। আর একটী বালিকা এই জ্বরে তাঁহার শুশ্রূষা করে, এই বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা। আশালতা বীরেনবাবুর খুড়তাত বোন—সে সুশ্রী ও সুশীলা। পূর্ব্ব হইতেই আশালতা নজরুলকে শ্রদ্ধার চ'ক্ষে দেখিত, এই শুশ্রূষা উপলক্ষে সে শ্রদ্ধা গভীর হইয়া উঠিল। যাহাহৌক ইঁহাদের ঐকান্তিক সেবায় নজরুল আরোগ্যলাভ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি আর এখন এই পরিবারে অতিথি মাত্র নহেন; একটা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

আশালতাব জননী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও কুমিল্লার বাসায় থাকিতেন। নজরুলের গুণে তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং নজরুলকে অত্যন্ত স্নেহের চ'ক্ষে দেখিতেন। নজরুলের প্রতি কন্যার শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বরং ইহাতে তিনি খুসীই হইলেন। নজরুলও

কন্যার শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রতিদান দিতে পরান্মুখ নহেন, একথা জানিয়া তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া নজরুল কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কোন বন্ধুর সহায়তায় তিনি "ধূমকেতু" নামক একখানি অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বিদ্রোহী" নামক কবিতা লইয়া এই ধূমকেতু প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার ওজস্বিনী কবিতা ও গদ্য রচনার জন্য অত্যল্প কাল মধ্যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে প্রকাশিত হইবামাত্রই সহস্র সহস্র খণ্ড "ধূমকেতু" বিক্রয় হইতে থাকে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ না যাইতেই এই ধূমকেতুতে প্রকাশিত এক কবিতার জন্য নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও কারাদণ্ডিত হন।

নজরুলের কারাদণ্ডের পরে শ্রীযুত অমরেশ কাঞ্জিলাল "ধূমকেতুর" সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ; কিন্তু দুই এক সপ্তাহ পরেই আর্থিক কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

প্রকৃত আকর্ষণ দূরত্বের ব্যবধানে ছিন্ন হয় না। যে ভালবাসা স্বার্থগত বা দৈহিক, দূরত্বের ব্যবধান তাহাকেই ছিন্ন করিতে পারে। কিন্তু ভালবাসা যেখানে হৃদয়ের গোপন উৎস হইতে উৎসরিত, প্রেম যেখানে পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল, সেখানে তাহার বিনাশ বা বিলোপ সাধন করিতে পারে কে? দীর্ঘ একটী বৎসর কাল জেলে থাকিলেও জেল হইতে ফিরিবামাত্রই সেন-পরিবারের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। বরং এইবারে সে সৌহার্দ্দ্য এত নিবিড় হইয়া উঠিল যে তাঁহার সহিত শ্রীমতী আশালতার বিবাহ দিবার জন্য গিরিবালা দেবী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

বীরেনবাবুর এই বিবাহে বিশেষ মত ছিল না। তথাপি তিনি যখন দেখিলেন যে বিবাহ অপরিহার্য্য, তখন তিনি নজরুলকে 'শুদ্ধি' গ্রহণ

করিয়া বিবাহ করিতে অথবা ব্রাহ্ম মতে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে বলিলেন। কিন্তু নজরুল বলিলেন যে তিনি 'শুদ্ধি' গ্রহণ করিতে পারিবেন না—কারণ নিজেকে তিনি অশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। আর ব্রাহ্ম-বিবাহেও তাঁহার মত নাই, যেহেতু ব্রাহ্ম-বিবাহ রেজিষ্ট্রি কালে "আমি হিন্দু নহি, আমি মুসলমান নহি, আমি খৃষ্টান নহি—প্রভৃতি স্বীকৃতি বাণী উচ্চারণ করিতে হয়। তবে তিনি একথাও বলিলেন যে, তিনি যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তখন অন্যকেও (আশালতাকে) মুসলমান হইতে বলিবেন না। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের নিজ নিজ ধর্ম্ম-মতেই থাকিবেন, অথচ বিবাহ কার্য্য মুসলমানী প্রথায় নিষ্পন্ন হইবে।

কিন্তু ওদিক্ দিয়াও গোল বাধিল। কন্যা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে এবিবাহে কোন সাহায্য করিতে পারিবেন না বলিয়া মোল্লারা অভিমত প্রকাশ করিয়া বসিলেন। বর ও কন্যাপক্ষ প্রমাদ গণিলেন। তখন এমন অবস্থা উদয় হইয়াছে যে বিবাহ না দিলেই নয়।

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ ওয়াকিবহাল মৌববী মৈনুদ্দীন হোসেন বি-এ নজরুলের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু। নজরুল তাঁহার কাছে পরামর্শ চাহিলেন। কোরাণ ঘুঁাঠিয়া মৈনুদ্দীন সাহেব এই হদিস্ বাহির করিলেন যে, পাত্রী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও "আহ্‌লে কেতাবী" মতে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে। যাহারা স্বর্গীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই "আহ্‌লে কেতাবী"। পাঠকগণের অবশ্যই স্মরণ আছে, ব্রাহ্মেরা "আহ্‌লে কেতাবী" নহেন বলিয়াই শান্তি-দাসের সহিত হুমায়ূন কবিরের বিবাহ অনেক মুসলমানের মতে নাকি আইনসিদ্ধ বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু আশালতা অপৌরুষেয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকারী হিন্দুর কন্যা বলিয়া এক্ষেত্রে তেমন কোন বাধা রহিল না।

বলা বাহুল্য মোল্লারা হুসেন সাহেবের এই হদিসে কাণ দিলেন না। তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, একটী হিন্দু কন্যাকে ইস্‌লাম কবুল

করাইতে পারিলে যে 'সোয়াব' হয়, তাহা হইতে তাঁহারা কেন বঞ্চিত থাকিবেন! কিন্তু আশালতাও মুসলমান হইলেন না, তাঁহাদের নিকটেও বেহেস্তের দুয়ার খোলা হইল না।

১৯২৫ সালের ২২শে এপ্রিল বেলা দুই ঘটিকায় শুভ বিবাহের লগ্ন ধার্য্য হইল। কলিকাতায় ৫নং হাজি লেনে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। এই বিবাহ উপলক্ষে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিরিবালা দেবী পূর্ব্ব হইতেই নজরুলের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, কন্যাকে লইয়া তিনি ঐ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। দেড় হাজার টাকার একটী দেন্-মোহর সম্পাদিত হইল। অন্য কোন মোল্লা কাজি হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় মৈনুদ্দীন সাহেবই কাজীর কার্য্য করিলেন। মিঃ ওয়াজিদ আলি 'উকীল শ্বশুবের' কার্য্য করিবেন স্থির হইল।

নজরুলের ১৫।১৬ জন মুসলমান বন্ধু-বান্ধব এবং ২।১ জন হিন্দু বন্ধু বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। মুসলমানী প্রথামত কন্যাকে সুসজ্জিত করিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঐ ঘরে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল।

'উকীল শ্বশুর' পাত্রী আশালতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি কাজী নজরুল ইস্লামকে স্বামীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত?" যে সকল মেয়ে খুব লাজুক বা ভীরু স্বভাব, এক্ষেত্রে তাহারা অতি মৃদুস্বরে বলে 'কবুল'। আর যাহারা ইহাও বলিতে ভয় পায়, তাহারা তাহাদের স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ একটী জাঁতি দূরে নিক্ষেপ করে। আশালতা বেশ স্পষ্ট ভাষায়, সকলে শুনিতে পায় এমনভাবে বলিলেন—"আমি স্বামীত্বে বরণ করিলাম।"

এই একটী মাত্র কথায়ই মুসলমান-বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। যাহাহৌক্ মুসলমান মতে প্রার্থনা করা হইল। কিন্তু নজরুলের ইচ্ছানুযায়ী রেজিষ্টারী কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিবাহের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী স্বীয়



বিয়ের মেলা—বেল্‌জিয়মে প্রতি বৎসর একটী বিবাহের মেলা হয়। ঐ মেলায় নিকটবর্ত্তী সহর ও মফঃস্বলের অসংখ্য নরনারী সমবেত হইয়া থাকে। বিবাহেচ্ছুক নরনারী জামার বোতামে একটী ছোট 'মগ' বাঁধেন। মেলায় মনোনীত ⟨ engaged ⟩ পাত্র পাত্রীকে চুম্বন করিতেছে—ফটোতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-পন্থীগণ ভদ্র নরনারীর জন্য নানাপ্রকার মেলার আয়োজন করিয়া থাকেন, শীঘ্রই বিয়ের মেলার আয়োজন করিবেন আশা করা যায় কি ?

পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নজরুলের তত্ত্বাবধানে স-কন্যা কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। নজরুল শুদ্ধি গ্রহণ করিতে বা ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বীরেনবাবু এই বিবাহে কোন অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হ'ন এবং সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, মুসলমানের সহিত খুল্লতাত তনয়ার বিবাহে তাঁহার আদৌ সহানুভূতি নাই; তাঁহার খুড়ীমা গিরিবালা দেবী তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারস্থ অপর সকলের সম্পূর্ণ অমতে মুসলমানে কন্যাদান করিতেছেন। এজন্য তিনি অতঃপর খুড়ীমাতার সহিতও সমদয় সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইলেন।

হিন্দু জন-সাধারণ শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সেনের ন্যায় একজন শিক্ষিত ও সদ্বংশজাত ভদ্রলোকের নিকট হইতে এমনি উক্তির প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে গিরিবালা দেবীও এই মর্ম্মে এক নিবেদনপত্র সংবাদপত্রগুলির মারফৎ প্রচার করেন যে,—দুইটী হৃদয়ের মধ্যে অকপট ও অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে জানিয়া আমি তাহাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মিলনাকাঙ্ক্ষা যেখানে অন্তরের অন্তস্থল হইতে উদ্বুদ্ধ, ধর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য সেখানে পশ্চাৎপদ হওয়া আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। আশা করি দেশবাসী বর ও কন্যা উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া এই কার্য্যে আমার সহায়তা করিবেন।

হিন্দু-বিধবা গিরিবালা দেবীর এই বিবৃতিতে লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নজরুল ইসলাম যেমন কবি হিসাবে তরুণীগণের নিকটে বিবাহযোগ্য বলিয়া আকাঙ্ক্ষনীয় হইতে পারেন, আশালতার ন্যায় স্ত্রী পাওয়াও তেমনি নজরুলের ন্যায় পুরুষের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তিনি সুন্দরী, মিষ্টভাষিণী এবং গৃহকর্ম্মনিপুণা। সংসারে

যে তিনি উপযুক্ত গৃহিনী, এ পরিচয় তাঁহার বিবাহিত জীবনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে। বিবাহের পরে বহুদিন নজরুল ইস্‌লামের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল না; সাচ্ছল্যের দিনেও নজরুলের অমিতব্যয়িতা সংসারের আর্থিক শৃঙ্খলতায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। কিন্তু পত্নীর মিতব্যয়িতায় ঐ বিশৃঙ্খলতাও সুশৃঙ্খলায় পরিণত হইয়াছে। নজরুলকে প্রায়শঃ নানাস্থানে নানা রকমের সভা-সমিতি, পার্টি, বৈঠক বা জন-সভায় যোগদান করিতে হয়। যাইবার সময়ে হয়তো তিনি বাসায় বলিয়া যাইবারও অবকাশ পান না। এই সময় আশালতাকে নানা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় থাকিতে হয়। এই সকল অবস্থায় সুষ্ঠরূপে সংসার পরিচালনা করা যে-কোন গৃহিণীর পক্ষেই কষ্টকর। নজরুলের গৃহিণী কিন্তু সকল অবস্থাতেই উত্তমরূপে সংসার চালাইয়া আসিয়াছেন, অথচ সেজন্য স্বামীর সকাশে এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা না হইলেও আশালতা শিক্ষিতা মহিলা। যদিও স্বামীর স্থায় প্রখর কবিত্ব শক্তি তাঁহার নাই, তথাপি তিনি কবিতা লিখিতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহিলা সংখ্যা "সওগাতে" তাঁহার একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কবিতাটীতে একটী দুঃখিতা ও প্রণয়-বঞ্চিতা নারীর হৃদয়ের সুন্দর আলোখ্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

নজরুল-গৃহিনী যে মনুষ্যোচিত তেজস্বিতা গুণেরও অধিকারিণী তাঁহার জীবনের একটী ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনাটী এই—

কিছুদিন পূর্ব্বে কাজী সাহেব একখানা কাব্য গ্রন্থের জন্য রাজরোষে পতিত হ'ন। ঐ পুস্তকের সন্ধানে পুলিশ তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আইসে। বাড়ীর একটী ঘর তালাবদ্ধ ছিল। অপরাপর সকল ঘর তল্লাস করিয়া সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর ঐ ঘরটী দেখিতে চাহেন। কাজী

তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার পত্নী ঐ ঘরের তালা খুলিয়া সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখাইয়া বলেন, "আমার মৃত পুত্রের ব্যবহৃত জিনিষগুলি এইঘরে সাজানো। আমরা সাধারণতঃ এ'ঘরে যাইনা। যদি একান্তই তল্লাস করিতে হয়, তাহা হইলে যেন এমন ভাবে তল্লাস না করেন যাহাতে আমার মৃত পুত্রের অবমাননা হইবে।" সাব্‌ইন্‌স্‌-পেক্টর আর ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন না। কোন বন্ধুর নিকটে তিনি বলিয়াছেন, "কাজীর স্ত্রী এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন যে, তাহার পর ঐ ঘরে প্রবেশ তো দূরের কথা—মনে একটু বেদনাই অনুভব করিলাম।"

নজরুল ইস্‌লামের এই মৃত পুত্রের নাম ছিল "বুল বুল"। বালক জীবিত থাকিতেই নজ্‌রুল তাঁহার একখানি গীতিগ্রন্থের নাম "বুল বুল" রাখিয়াছিলেন। বালকের মৃত্যুর পরে কবি তাঁহার "নজরুল-গীতিকা" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ বুল্‌বুলের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গের কবিতাটী বড়ই মর্ম্মন্তুদ্‌। এতদ্ভিন্ন কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম ও তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু যে সঙ্গীত বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারও নাম দেওয়া হইয়াছে "বুল বুল সঙ্গীত বিদ্যালয়"।

বুল্‌বুল্‌ ব্যতীত তাঁহাদের আরও একটী সন্তান স্নেহশীল পিতা-মাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দুইটী পুত্র জীবিত আছে—ইহাদের নাম লেনিন ও সান্‌ইয়াৎ-সেন। ছেলে দুইটী জননীরই ন্যায় গৌরবর্ণ ও সুশ্রী হইয়াছে। ভগবান্‌ তাহাদিগকে দীর্ঘায়ু দান করিয়া কবি-দম্পতির জীবন সুখময় করুন।

যতই ভাব-প্রবণ প্রবৃত্তির হৌন না কেন, পত্নীর প্রাণঢালা প্রেমের প্রতিদান দিতে নজরুল কার্পণ্য করেন নাই। নারী-জাতির প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত, সেই ভাব-প্রবাহ কবির পত্নী-প্রেমকে কোথাও ব্যাহত করে নাই। বহু কবিতা তিনি স্বীয় পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন; এই সকল কবিতা

কবির "দোলনচাঁপা" নামক গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। "দোলনচাঁপা" আশালতার স্বামী-প্রদত্ত নাম। তাঁহার বাল্যের "দুলী", "দুলালী" বা "দোলন" নামটী স্বামীর প্রেম-সৌরভে সুরভিত হইয়া উঠিয়া এই নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদের মনে হয়, প্রেম-সঞ্জাত বিবাহ নজরুলের কাব্যধারায় এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার কাব্যে তেজস্বিতার পরিচয় ছিল, উদ্দীপনা ছিল, শব্দের কসরৎ ও ভাষার প্রাঞ্জলতা ছিল, কিন্তু যথার্থ মাধুর্য্য বা কাব্যপ্রাণ তাহাতে ছিল না। বিবাহের পরেই তাহা মাধুর্য্য-রসে সিক্ত হইয়া উঠে। সে মাধুর্য্য আবার এমনি মনোরম যে গীতি-কণ্ঠে ধ্বনিত তাহার রেশ আজ সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, দেশের সর্ব্বত্রই—ধনৈশ্বর্য্যমণ্ডিত অভিজাত-গৃহ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহা প্রতিধ্বনি হইতেছে। এতবড় সম্মান এদেশে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত লাভ করেন নাই। মরুভূমির ধূলি-কঙ্করময় রণপ্রাঙ্গন হইতে কবিকে এই স্নিগ্ধ-শীতল বিহগ-গীতি-মুখর শ্যামলারণ্যে টানিয়া আনিয়াছেন কবি-প্রিয়া স্বয়ং এবং সখ্য-বিবাহের ইহাই যথার্থ সাফল্যের পরিচয়।

অনুপমা ঘোষ + নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

অকপট প্রেম বা অনুরাগের ধর্ম্মই এই যে—বাধা পাইলেই তাহা প্রবল হইয়া ওঠে। বহু বীর পুরুষ ও বীর নারী পরস্পরের প্রতি অকপট অনুরাগ বশে বিপুল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিয়া পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই প্রকার উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তার পরিণয় কাহিনী পবিত্র প্রেম-জগতে চির ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। বীর-বালা সংযুক্তা পৃথ্বিরাজের শৌর্য্যবীর্য্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া হৃদয় মন্দিরে তাঁহাকে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। পৃথ্বিরাজের কথা শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন, পৃথ্বিরাজের কাহিনী পাঠ করিতে তাঁহার চিত্ত হর্ষপুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পৃথ্বিরাজের চিত্র দেখিয়া রাজকুমারী সংযুক্তা আর নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না, মীনের মত নির্নিমেষ নেত্রে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। পৃথ্বিরাজকে তিনি চক্ষে দেখেন নাই—মনশ্চক্ষে পৃথ্বিরাজের বীর মূর্ত্তি তিনি দেখিতেন আর সময় সময় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। মনে মনে পৃথ্বিরাজকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। গোপনে তিনি সখীগণকে বলিতেন—পৃথ্বিরাজকেই আমি আমার হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি—এ হৃদয় তাঁহাকেই দান করিয়াছি। সাক্ষী তোমরা—আর সাক্ষী অন্তর্যামী দেবতা। যখন শিবপূজা করি তখন সতীনাথকে বলি—হে দেবাদিদেব তুমি কুমারীর আশা পূর্ণ করিও, আমার চিরপূজ্যকে সেবা করিবার অধিকার দিও।

সখীরা বলিত, তুমিত পৃথ্বিরাজকে মনপ্রাণ সপিয়া দিলে কিন্তু এ আত্ম-নিবেদন পৃথ্বিরাজ কেমন করিয়া জানিতে পারিবেন? কেমন করিয়া বুঝিবেন যে তুমি তাঁর অনুরাগিণী! তাঁহাকেই তুমি পতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছ?

সখীরা উপদেশ দিল—পৃথ্বিরাজকে পত্র লিখিয়া তোমার এই পবিত্র প্রেম নিবেদন কর।

সংযুক্তা বলিলেন—পত্রই লিখিব কিন্তু পত্র লিখিলেই কি তাঁহাকে পাইব? পিতা যে বাদী, তোমরা কি শুনিয়াছ আমার বিবাহের জন্য পিতা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করিতেছেন? পিতার প্রতিজ্ঞা—সেই সভায় সকল ক্ষত্রিয় নৃপতিকেই আমন্ত্রণ করিবেন কিন্তু পৃথ্বিরাজকে নিমন্ত্রণ করিবেন না। শুনিয়াছি পৃথ্বিরাজকে অপমানিত করিবার জন্য তাঁহার মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দ্বারপাল বেশে রাখিয়া দিবেন।

সখীরা ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং বলিল পবিত্র মিলনের পথ এই-রূপেই কণ্টকাকীর্ণ—বিশুদ্ধ প্রেমের পথ বাধাবিঘ্ন সঙ্কুল।

কিন্তু সংযুক্তা বীর নারী—তিনি সকল কথা পত্র দ্বারা পৃথ্বিরাজের গোচর করিলেন এবং বলিলেন—স্বয়ম্বর সভার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আমার হৃদয়েশ্বরের গলেই আমি বরমাল্য প্রদান করিব। আপনি বীর—বীর-নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

সংযুক্তা স্বয়ম্বর সভায় সমাসীন কোন নৃপতির গলে বরমাল্য প্রদান না করিয়া দ্বারপাল-বেশী পৃথ্বিরাজের গলেই মাল্য অর্পণ করেন, এবং তাঁহার চরণ তলে বসিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকেন। পৃথ্বি-রাজের উত্তর পত্রে সংযুক্তা জানিতে পারিয়াছিলেন যে পৃথ্বিরাজ দ্বারদেশ হইতেই তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন, সংযুক্তা যেন প্রস্তুত থাকেন।

পৃথ্বিরাজের মৃন্ময় মূর্ত্তির গলে মাল্যদানের অব্যবহিত পরেই অশ্বা-রোহণে পৃথ্বিরাজ আচম্বিতে সেই স্থানে আসিয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে

তুলিয়া লইলেন এবং যেমন বায়ুবেগে আসিয়াছিলেন তেমন বায়ুবেগেই চলিয়া গেলেন।

তোমরা কি বলিতে পার পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তার এই পরিণয় সুধীবৃন্দের সমর্থন যোগ্য নহে! ভারতের কাব্য সাহিত্য পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তার প্রেম কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কি গৌরব অনুভব করে নাই!

ইহা অবশ্য দূর অতিতের কাহিনী। ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের অস্ত্র ঝনঝনার ভিতরে বীর ও বীরবালার শুভ পরিণয় যে বীরত্ব ব্যঞ্জক এবং পবিত্র প্রেমের দ্যোতক ইহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু আধুনিক যুগে এই বাংলা দেশে পরিণয়ে যে প্রগতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাও সামান্য বীরত্ব ও পবিত্র প্রেম-ব্যঞ্জক নহে। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকটী অসবর্ণ প্রগতি-বিবাহ হইয়াছে তাহাতে পতিপত্নীর মধ্যে প্রেমের পবিত্রতা এবং অনুরাগের নিষ্ঠা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

ইহা আমাদের কল্পনার কথা নহে, আমরা উদাহরণ দ্বারা দেখাইব যে আধুনিক অসবর্ণ সখ্য-বিবাহে (Love marriage) প্রকৃত বিবাহোচিত পবিত্র প্রেমের বিশেষ অপহ্নব ঘটে নাই।

এই আখ্যায়িকার নিখিলবন্ধু কোন্ নিখিলবন্ধু জানেন কি? দক্ষিণেশ্বরের সেই প্রসিদ্ধ বোমার মামলায় ইঁহার পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড হয়। যে সময়ে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বোমার মামলার বিচারাধীন আসামীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী ভূপেন্দ্রবাবু আলিপুর জেলের ভিতরে লোহার ডাণ্ডার আঘাতে নিহত হন। এই খুনের মামলায় নিখিলবন্ধুও জড়াইয়া পড়েন এবং বিচারে তাঁহার প্রতি দ্বীপান্তর দণ্ডের বিধান হয় কিন্তু হাইকোর্টের আপিলের ফলে হত্যাপরাধে তিনি মুক্তি লাভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বোমার মামলায় তাঁহার পাচ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল, সেই দণ্ডভোগ করিয়া তিনি কারাগার হইতে বহির্গত হন।

নিখিল বন্ধুর নিবাস যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমায়। নিখিলের বর্ত্তমান বয়স প্রায় ২৮ বৎসর, ইনি আই এস্-সি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে নিখিলবন্ধু দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান। সচ্চরিত্র এবং পরম মাতৃভক্ত, সহোদরগণের প্রতিও অপরিসীম অনুরাগ। পল্লী-সেবায় ইঁহার আন্তরিক আকর্ষণ বাল্যকাল হইতেই ছিল। যৌবনে ইহা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। তিনি দুর্গতদের বন্ধু এবং রুগ্ন ও আর্ত্তের সেবায় সততই তৎপর।

নিখিলের বন্ধুগণ বলেন নিখিল অকপট স্বদেশী কিন্তু ইহার চিত্ত অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। বিপ্লবের ভ্রান্ত পথে যে সকল যুবকের কর্ম্মশক্তি উন্মার্গগামী হইয়াছে এবং বিকৃত বুদ্ধি বশে বোমা প্রভৃতিকে দেশোদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে নিখিল বন্ধুকেও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

নিখিল বন্ধুর ভাব-প্রবণ তরুণ চিত্ত দেশের কায করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত। কারাগার হইতে বাহির হইয়াও তিনি দেশের কার্য্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই; বরং অধিকতর নিষ্ঠার সহিত সেই কার্য্য করিতে থাকেন।

শ্রীমতী অনুপমা ঘোষ ও অকপট দেশ-সেবিকা। কৈশর হইতেই তিনি দেশের কল্যাণকর কার্য্যে সহায়তা করিতেন এবং দেশকর্ম্মীগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রের উপাসিকা, এবং দেশের কাজে হিংসানীতি অবলম্বন অন্যায় বলিয়া মনে করেন। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির সমর্থক বলিয়া শ্রীমতী অনুপমা কংগ্রেসের প্রদর্শিত দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীমতী শান্তিদাসকে সম্পাদিকা করিয়া কলিকাতায় যখন নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়, অনুপমা ঐ সমিতির সদস্য হ'ন। নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের অধীনে

ইনি কিছুদিন বড়বাজার ও অন্যান্য স্থানের কাপড়ের দোকান সমূহে পিকেটিং করেন। দৈনিক বঙ্গবাণী ও সাপ্তাহিক নবশক্তির ইনি নিয়মিত পাঠিকা; ঐ কাগজ দুইখানি তাঁহাকে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনে প্রেরণা দিয়াছে, তেমনি চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয় হিন্দু সমাজের কঠোরতার বিরুদ্ধেও তাঁহার মনকে বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল না কে বলিবে!

বাঙ্গালী ছেলেরা যেমন আপন কায সম্পাদন করিতে লাগিলেন, অপর দিকে বাংলার মেয়েরাও পিছু হটিয়া রহিলেন না। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া সমান উৎসাহে 'ড্রিল' করিয়াছে, বাংলার কন্যা কটি দেশে কাপড় জড়াইয়া বীরাঙ্গনার বেশে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝেও ছেলেদের সঙ্গে মার্চ্চ্ করিয়া গিয়াছেন, সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব লইয়া বাংলার আদরের দুলালীরাও নিজ নিজ কায করিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই নারী বাহিনী লইয়া মতদ্বৈধ থাকিতে পারে কিন্তু নির্ব্বিবাদে তাঁহারা কায করিয়াছেন।

এই সেবাকার্য্য করিবার সময় কর্ম্মক্ষেত্রে অনুপমার সহিত নিখিলের পরিচয় হয়। নিখিল বন্ধুও তখন পূর্ব্বমত ত্যাগ করিয়া অহিংস মন্ত্রই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের কার্য্য করিতে করিতে ইহাদের এই পরিচয় যতই দৃঢ় হইতে লাগিল ততই উভয়ে উভয়ের গুণের অনুরাগী হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

সে সময়ে নিখিলবন্ধুর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তাহার পর মাঝে মাঝে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িত, সে সময়ে শ্রীমতী অনুপমা তাঁহার এই সেবক বন্ধুকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এই বিপন্ন অবস্থায় এই সহৃদয়া মহিলার সাহায্য না পাইলে তাঁহাকে যে বিশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইত তাহা বলাই বাহুল্য।

অনুপমা অশিক্ষিতা নহেন, কলিকাতার শিক্ষিত কায়স্থ পরিবারের

শিক্ষিতা কন্যা। সেবা কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া কিছু কিছু নার্সিং ও ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন। কবিতা রচনায় তাঁহার হাত আছে। অনুপমা ভাল গান গাহিতে পারেন, সূচী শিল্পে তিনি বিশেষ নিপুণা, তিনি আধুনিক যুগ সম্মত সকল প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিতা।

কলিকাতায় যে নারী কংগ্রেস হইয়াছিল তাহাতে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বড়বাজারে পিকেটীং এর সময়ে অনুপমা মহিলা পিকেটারগণের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

দেশবাসীর কল্যাণের জন্য যখনই প্রয়োজন বুঝিয়াছেন তখনই অর্থ-সাহায্য করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই।

অনুপমার অর্থের অভাব না থাকিলেও বিলাস ব্যসনে অর্থব্যয় করা তিনি অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। পোষাক পরিচ্ছদের বাহুল্য তিনি ভাল বাসেন না, সাদাসিধা ধরণে থাকাই পছন্দ করেন।

নিখিলবন্ধুর অনাড়ম্বর সাদাসিধা চালচলন এবং অকপট ব্যবহার বিশেষ ভাবে অনুপমার মর্ম্ম স্পর্শ করে। সেই সময় হইতে নিখিলবন্ধুর দিকে তিনি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখেন। বলা বাহুল্য নিখিলবন্ধুও অনুপমার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন্। অনুপমা দেখিতে সুন্দরী না হইলেও তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্য নিখিলবন্ধুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। নিখিলের প্রাণের সাড়া পাইয়া অনুপমা বুঝিলেন সে নিখিলই তাঁহার যোগ্য স্বামী, এবং তিনি নিখিলকেই স্বামীত্বে বরণ করিবেন।

কোন কলেজের অধ্যাপকের নিকট নিখিলবন্ধু নিজে বলিয়াছেন :—অনুপমা নানা ভাবে আমার উপকার করিয়াছে। বলিতে কি সে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—সত্যই সে আমার জীবন দাত্রী—এই অনু একদিন নিজেই আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব: করে—সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ মনে মনে আমিও

অনুর অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনুর দেশের প্রতি, আর্ত্তের প্রতি—বিপন্নের প্রতি—ব্যথিতের প্রতি সমবেদনা—কর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা—ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতি ঘৃণা—সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ এবং সর্ব্বোপরি তাহার নির্ম্মল চরিত্র কেবল সে আমার প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার প্রতি আমার সম্ভ্রমেরও সঞ্চার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম অনু যদি আমাকে বিবাহ করিতে চায় তাহা হইলে জাতিভেদের বাধা দূর করিয়া আমি তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব এবং তাহাতে কোন দোষ হইবে বলিয়া আমি মনে করিনা।"

নিখিলবন্ধু অনুপমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন নাই, গুণে আকৃষ্ট হইয়াই পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। রূপের আকর্ষণে অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে কিন্তু গুণের আকর্ষণে সমাজের প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণ যুবক কর্তৃক কায়স্থ কন্যার পাণি গ্রহণ এদেশে কদাচিত দৃষ্ট হয়।

ইহাদের বিবাহ হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে কন্যার বাড়ীতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে—বিবাহে শালগ্রাম শিলা আনা হইয়াছিল এবং পুরোহিতও ছিলেন। কন্যার আত্মীয়গণের এ বিবাহে অমত ছিল না কিন্তু বরের আত্মীয় স্ব-গণ এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন।

প্রায় এক বৎসর হইল ইহাদের বিবাহ হইয়াছে। আমরা এই দম্পতির দীর্ঘজীবন কামনা করি—তাঁহারা জয়যুক্ত হউন।

বীণা চট্টোপাধ্যায়+মুকুল দে

শ্রীরামপুরের এক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে শ্রীমতী বীণা দেবীর জন্ম হয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্ম্মচারী তাঁহার পিতা। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে সেই বংশের প্রতিষ্ঠা নিতান্ত কম নহে। উচ্চতম পুলিশ-কর্ম্মচারী হইলেও বীণার পিতা স্বয়ং নিষ্ঠাবান হিন্দু; সকাল সন্ধ্যায় রীতিমত সন্ধ্যাহ্নিক এবং গৃহদেবতার পূজার্চ্চনাদি হয়। কার্য্য ব্যপদেশে স'পরিবারে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া বীণাকে তিনি স্কুল-কলেজে পড়াইতে পারেন নাই, কিন্তু বাড়ীতে যতটুকু শিক্ষা-দান সম্ভবপর কন্যাকে ততটুকু লেখা-পড়া শিখাইতে তিনি ত্রুটী করেন নাই।

তবে লেখা-পড়া শিক্ষাদান অপেক্ষা কন্যাকে আর একদিকে উচ্চ শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি নিজে ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু; প্রিয়তমা দুহিতার অন্তরও ধর্ম্ম-প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হয় ইহা ছিল তাঁহার একান্ত বাসনা। তাই তিনি নিজের আহ্নিকের ও পূজার্চ্চনার জোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিবার ভার কন্যার উপরই দিয়াছিলেন; বীণাও সানন্দে সে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রতিদিন বীণা সযত্নে পিতার আহ্নিকের স্থান করিয়া দিতেন, পূজার জন্য ফুল তুলিয়া চন্দন ঘসিয়া রাখিতেন—ঠাকুর-ঘরের শুচিতা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতেন। দেখিয়া বীণার পিতৃ-বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—"যৌবনে যোগিনী হওয়ার একটা কথা আছে—তা বীণা কি শৈশবেই যোগিনী হবে নাকি?"

শুনিয়া বীণা মুচ্‌কি হাসিত, কথা কহিত না। বালিকা স্বভাবতঃ

স্বল্পভাষিনী ও লাজুকস্বভাবা ছিল। কুমারী অবস্থায় পালনীয় ব্রতাদিও সে শ্রদ্ধার সহিত করিত। 'পুন্যিপুকুর' তাহার অতি প্রিয় ব্রত ছিল। পিতার শিক্ষায় সে শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সদ্যস্নাতা কিশোরী যখন সিক্ত কেশরাশি পিঠের উপর এলাইয়া দিয়া মৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া শিবের মাথায় বিল্বপত্র রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর, আমি যেন তোমারই তুল্য বর পাই," তখন বুঝি উমাপতি শিব স্বয়ং সেই শিবলিঙ্গ মধ্যে আবির্ভূত হইয়া নির্ব্বাক্ ভাষায় বলিতেন—"তথাস্তু!"

দেখিতে দেখিতে বীণা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল. বীণার পিতা বীণার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। হিন্দুর ঘরের মেয়ে কতদিন আর অবিবাহিত রাখা চলে? কন্যার বিবাহ দিতে যাহারা অহেতুক কালবিলম্ব করেন, গৌরীদানের পরিবর্ত্তে যুবতী-বিবাহেই যাহাদের সমধিক রুচি, বীণার পিতা সে-শ্রেণীর লোক ছিলেন না। অনেক খুঁজিয়া বীণার জন্য তিনি পাত্র স্থির করিলেন। বীরভূম জিলার যে অংশ সাঁওতাল পরগণায় পরিণত হইয়াছে, তথাকার নূলটী নামক ভদ্রপল্লীতে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবকের সহিত তিনি বীণার বিবাহ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে উৎসব-কোলাহল মুখরিত বিবাহ-বাসরে অগ্নি-সাক্ষী করিয়া শরদিন্দু ও বীণা পরস্পর পরস্পরকে জীবন-মরণের সঙ্গীও সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিলেন।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় বংশমর্য্যাদা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হৃদয়ে শৈশবাবধি স্বদেশানুরাগ প্রবল ছিল। তিনি যখন বি-এ পড়িতেছিলেন, তখন অসহযোগ আন্দোলনের উচ্ছল তরঙ্গে সমগ্র দেশ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ ও আত্মস্বার্থে কর্ণপাত না করিয়া শরদিন্দু সেই তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বীরভূম জিলার তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী, শ্রীযুত গোপিকাবিলাস

সেন প্রমুখ বীরভূমের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মিগণের তিনি ছিলেন সহকর্ম্মী। বীরভূমের স্বনামখ্যাত নেতা অধ্যাপক শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিতও তিনি একযোগে কংগ্রেসের কাজ করিয়াছিলেন। কর্ম্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততার দরুণ তিনি বীরভূম জিলা-কংগ্রেস-কমিটীর সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হ'ন। এই পদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

শরদিন্দুর ন্যায় উন্নতহৃদয় যুবককে লাভ করিয়া বীণা নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। স্বজনবর্গ বলাবলি করিতে লাগিল—বীণার শিবপূজার ফল ফলিয়াছে, সত্যই সে শিবতুল্য বর পাইয়াছে। বীণা নিজেও এই বিবাহে আন্তরিক সুখী হইয়াছিল; আপনার হৃদয় উজার করিয়া সবটুকু ভালবাসা সে স্বামীকে ঢালিয়া দিয়াছিল। স্বামীও অবশ্য প্রতিদানে তাহাকে প্রাণঢালা ভালবাসায় সিক্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাহাদের দুইজনার বিবাহিত জীবন এত মধুর ছিল যে বীণার সখীরা ও শরদিন্দুর বন্ধুরা বলিত, "এমন সুখী দম্পতি আর হয় না। এই ঘোর কলিযুগে ইহারা যেন সাবিত্রী আর সত্যবান।"

বীণাকে সাবিত্রীর সহিত তুলনা করিবার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। যে পবিত্রতা ও আচার-নিষ্ঠা বীণার কুমারী-জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল, পতি-গৃহে আসিয়াও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন প্রাতে বীণা স্বহস্তে পবিত্র গোময়ের সাহায্যে গৃহ ও গৃহ-প্রাঙ্গন মার্জ্জনা করিত; প্রতি-সন্ধ্যায় স্বহস্তে তুলসী দেউলে দীপ দিয়া প্রণাম করিত। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অন্যান্য এয়োস্ত্রীগণের সহিত মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর ব্রত করিত। প্রতিদিন শয্যা ত্যাগের পরে স্বামীকে প্রণাম করিয়া তবে সে গৃহকর্ম্মে বাহির হইত। একদিকে যেমন সে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিত, অন্যদিকে স্বামীর সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তাহাও নিজ হাতেই করিত। স্বামীর আহারের সময় কাছে থাকিতে তাহার

কোনদিনও ভুল হইত না। কংগ্রেসের কাজ সারিয়া স্বামী যখন গৃহে ফিরিতেন, হাতের কাজ ফেলিয়াও সে তখনই স্বামীর কাছে উপস্থিত হইত; কর্ম্মক্লান্ত স্বামীকে বাতাস করিত, সাধ্বী পুণ্যবতী স্ত্রীর ন্যায় স্বামীর পদসেবা করিত।

দেশের কাজে স্বামীর কর্ম্ম-সঙ্গিনী হওয়ার বাসনাও বীণার মনে না জাগিত, এরূপ নহে। বীণার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রীর অবশ্যই জানা ছিল যে স্ত্রী শুধু স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী নহে—সর্ব্বকার্য্যের সহকারিণী, সর্ব্ব-সময়েব সহচরী, এককথায় স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিণী। কিন্তু পিতার নিকটে আদর্শ হিন্দুনারীর উপযোগী যে শিক্ষা সে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্বশুরালয়ে আসিয়া যে আহাওয়ার মধ্যে পড়িয়াছে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া নারী-জীবনের গৌরব-নিকেতন অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইবার মত তাগিদ্ সে হৃদয়মধ্যে অনুভব করিল না। তাই নিজে কংগ্রেসের সেবায় পথে বাহির না হইয়া স্বামী যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে কংগ্রেসের কাজ করিতে পারেন, তাহার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য সে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর সেবাই করিতে লাগিল। অবশ্য অবসর সময়ে সে চরকা লইয়া বসিত—নিজহাতে সূতা কাটিয়া সেই সূতায় কাপড় বুনাইয়া আনিয়া স্বামীকে উপহার দিত। শরদিন্দুও বীণার হাতে কাটা সূতায় তৈয়েরী খদ্দর পরিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। এই ভাবে শরদিন্দু ও বীণার মিলিত জীবন আশ্রম-কাননে পালিত চক্রবাক্-চক্রবাকীর ন্যায় পরম সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! অবিমিশ্র সুখ বিধাতা এ সংসারে কাহারও ভাগ্যে লিখেন নাই। শরদিন্দু ও বীণা প্রেম-মাধুরী-মণ্ডিত যে সুখনীড় গড়িয়াছিল, দুর্ভাগ্য-ঝটিকায় তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য বিধাতাও বুঝি সকলের অলক্ষিতে তাহাদের ভাগ্যাকাশের ঈশান কোণে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সঞ্চারিত করিতেছিলেন—

স্বামী শরদিন্দুর সহবাসে বীণা একটী কন্যা-সন্তান প্রাপ্ত হ'ন। সন্তানের আগমনে গৃহমধ্যে হর্ষকল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল। কন্যাকে উপলক্ষ করিয়া ভবিষ্য সুখের অনেক চিত্র স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুরদৃষ্টক্রমে অতি অল্প কাল মধ্যে কন্যাটী মারা যায়। কন্যার শোকে বীণা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। সে শোকে সান্ত্বনালাভ করিতে না কহিতেই নূতন বিপর্য্যয় আসিয়া তাঁহার অদৃষ্টচক্রকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে আবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়—

কন্যার মৃত্যুর অল্প পরেই দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শরদিন্দুও ইহলীলা সংবরণ করেন। পরলোকের ডাক যখন একান্তই আসিয়া পরে, তখন আর ইহ-সংসারের পানে ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ কেহ পায় না। পিতা-মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন, সুখময় সংসার, প্রেমময়ী ভার্য্যা—ইহজীবনের কোন্ আকর্ষণই না শরদিন্দুর ছিল। রুগ্ন-শয্যাপার্শ্বে বসিয়া যে রমণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতঃ দিনরাত্রি তাঁহার সেবা করিতেছিলেন, সতী সাবিত্রীর ন্যায় ভুজ-বন্ধে বাঁধিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে নারী মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁহার প্রেমময় আলিঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণের ইচ্ছা কি তাঁহার ছিল। কিন্তু অসহায় মানবের অনেক ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা তো নহেই। সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে পরলোকের আহ্বান সাড়া দিতেই হইল।

অনাহার অনিদ্রা অনিয়মে স্বামীর পরিচর্য্যা কালেই বীণার শরীর খারাপ হইয়াছিল; স্বামীর মৃত্যুতে সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সতী-সিমন্তিনী সাবিত্রী ও বেহুলার মৃতপতিকে পুনর্জ্জীবন দানের কাহিনী পুরাণেতিহাসে সে পড়িয়াছিল। একবার তাহার মনে হইল—উঁহাদের ন্যায় সেও মৃতপতিকে বাঁচাইয়া তুলিবে। কিন্তু পাপ কলিযুগে তো আর তাহা



একাদশ স্বামী—শ্রীমতী কেরোলিন—ম্যাক্‌ডোনেগু—ওয়ালটার—ব্রন্‌সন্‌স্—বার্জ্জেস্—সেভেলিয়ার—গার্ডনার—লুইগী—হুয়াইট—হ্যাটফিল্ড—উইল্‌স্—পাস্‌চাল্‌ তিনবার বিধবা এবং সাতবার বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এগার নম্বর স্বামীর ঘর করিতেছেন। এই ভাগ্যবান স্বামীর সঙ্গে শ্রীমতীর ফটো দেওয়া হইল।

শ্রীমতী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান সময়ে তৃতীয় স্বামীর চেষ্টায় আছেন—বাংলার সুদিন আসিতে আর বিলম্ব নাই

সম্ভবপর নহে। তাই স্বামীর অনুসরণ করিয়া মৃত্যু-লোকে যাত্রা করিবার জন্য সে সঙ্কল্পিত হইল। স্বামীর শ্মশান-শয্যায় সহমরণের অনুমতি কেহ তাহাকে দিবেনা জানিয়া তাহাতেও নিরস্ত হইল। অন্য উপায়ে মৃত্যু-বরণ করিয়া ইহলোকের পরপারে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবে স্থির করিল। স্বামীকে মালিশ করিবার জন্য যে ঔষধ আনা হইয়াছিল, সেই বিষাক্ত ঔষধের শিশি কেহ কোথায়ও সরাইয়া রাখিল।

রামপুরহাটের হাসপাতালের ডাক্তার রবিবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে তাহার জীবন-রক্ষা পাইল। ভগবান্ যাহার অদৃষ্টে চির-বৈধব্য লিখেন নাই সে কেমন করিয়া শাঁখা সিঁদূর বঞ্চিত রাহয়াই প্রাণত্যাগ করিবে? সংসার-সমুদ্রের এপারেই স্বামী-সঙ্গ যাহার ললাট-লিপিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া ওপারস্থ প্রতীক্ষমান স্বামীর সহিত মিলিত হইবে?

আদরিণী কন্যার অকাল-বৈধব্যের কথা শ্রবণে পিতা-মাতাও একান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। কন্যার সুখের জন্য স্নেহময় পিতার স্নেহ ও যত্নের ত্রুটী ছিল না; যে সুখ জীবনের তরে অন্তর্হিত দেখিয়া তিনি অগত্যা শোকে সান্ত্বনা দানের জন্য কন্যাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু পতি-বিরহের বাড়বানল যাহার হৃদয় মধ্যে প্রজ্জ্বলিত, সে কখনও স্বামীর স্মৃতি-রঞ্জিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পদার্পণ করিতে পারেনা। বীণা পিতৃ-গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। স্বামী-গৃহে থাকিয়া আমরণ স্বামী-স্মৃতি-ধ্যান হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যকে সে ব্যাহত হইতে দিল না।

আত্মহত্যা করিয়া পরলোকে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবার উদ্দাম বাসনা একটু সমাহিত হইয়া আসিলে বীনা শুদ্ধচারিণী ব্রহ্মচারিণী রূপে কঠোর বৈধব্য-জীবন যাপনের সঙ্কল্প করিলেন। একবেলা একমুষ্টি আতপান্ন মাত্র হইল তাঁহার আহার। ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতির ব্যবহার

একেবারেই ছাড়িয়া দিলেন। সেমিজ ও ব্লাউজ্ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র থান পড়িতে লাগিলেন। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া কাটিয়া তৈলহীন রুক্ষতায় সেগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিলেন। একাদশীর দিন তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন; কাহারও অনুরোধে জলবিন্দু গ্রহণে সম্মত হইতেন না। স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য তিনি "তর্পণ" নামক একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্বামীর আরব্ধ দেশ-সেবার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্বগ্রামে একটী মহিলা-সমিতিও গঠন করিলেন।

কিছুদিন পরে বীণা পিত্রালয়ে আসিলেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় উভয় স্থানেই তিনি সমভাবে আদৃতা ছিলেন। তাঁহার প্রতি পিতামাতার যেমন অসীম স্নেহ ছিল, শ্বশুর-শাশুড়ীও তেমনি তাঁহাকে লইয়াই পুত্রশোক ভুলিবার চেষ্টা করিতেন—তিনিও পিতৃ-মাতৃবৎ তাঁহাদের সেবা করিতেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। বাল-বিধবা বীণার ভবিষ্য জীবন যাপনের একটা কিছু উপায় করিয়া দিবার জন্য তাহার পিতৃ-কুল ও শ্বশুর-কুলস্থ সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু ইংরাজী ও বাংলা লেখা-পড়া জানিতেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠানো হইবে স্থির হইল। একটা বিধবা আশ্রম ঠিক করিয়া সেখানেই তাঁহাকে রাখা হইল। এই সময়ে তাঁহার কৃচ্ছ্র-সাধনও অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল; বিধবা-আশ্রমে একাদশীর দিবসে নিরম্বু উপবাসের রীতি নাই, অন্যান্য মেয়েদের ন্যায় বীণাও ঐদিন জল ও ফলমূল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মূলটী গ্রামে ও অন্যান্য কতিপয় বিধবা তাঁহার আদর্শে নিরম্বু উপবাস তুলিয়া দেন।

বিধবা-আশ্রমে বীণা বেশী দিন রহেন নাই; আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে বীণার পিতা বীণাকে লইয়া কিছুদিন পুরী ও

ভুবনেশ্বরে থাকেন। শুনা যায়, তাঁহার দ্বিতীয় স্বামী শ্রীযুত মুকুলদের সহিত ভুবনেশ্বরে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। বীণার ছিন্ন কেশপাশ আর তখন তেমন মলিন, তেমন রুক্ষ ছিল না। তিনি চুল রাখিয়াছিলেন এবং তৈল-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। থান কাপড়ের পরিবর্ত্তে কালো পেড়ে শাড়ী এবং সৌষ্ঠব-বিহীন শাদাসিদে সেমিজ ও ব্লাউজ্ পরিধান করিতেও তাঁহাকে দেখা গেল। রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁহার পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত হইল। সকাল-বেলায় আতপান্ন ও নিরামিশ ব্যাঞ্জনাদি এবং বৈকালে পরোটা ও তরকারী তাঁহার আহার্য্যের বিষয়ভুক্ত হইল। কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইবেন বলিয়া কিছুদিন হইতে যে জিদ্ ধরিয়াছিলেন, সে জিদও কমিয়া আসিল।

শ্রীযুত মুকুল দের সহিত বীণার পরিচয় কিরূপে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃতি ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না—পাঠক আমাদিগকে সে কার্য্য হইতে রেহাই দিন। তবে ইহা সত্য যে উভয়ের মধ্যে বিবাহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্বশুর-কুলের কেহ এই বিবাহের কথা পূর্ব্বে জানিতেনই না। বিবাহের পূর্ব্বক্ষণেও বীণা পূর্ব্ব শ্বশুর-গৃহে ছিলেন—হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। বীণার প্রথম স্বামী শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু নাকি এই বিবাহে বাধা প্রদানের চেষ্টাও করিয়াছিলেন; তাঁহার সে বাধা যে ফলবতী হয় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য।

পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কাহারও অনুপস্থিতিতেই শ্রীযুত মুকুল দের সহিত বীণার বিবাহ সম্ঘটিত হয়। শ্রীযুত দে খ্যাতনামা শিল্পী। শান্তিনিকেতন কলা-ভবনে ইনি ভারতীয় চিত্রকলা শিক্ষালাভ করিয়াছেন

এবং বিলাতের নানা স্থানের শিল্প-বিদ্যালয় সমূহে উচ্চতর পদসমূহে কার্য্য করিয়া অবশেষে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই উচ্চ পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। পদস্থ ও উচ্চ শিক্ষিত স্বামীর সহবাসে বীণা অবশ্যই তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের বৈধব্য-সন্তপ্ত-হৃদয়কে নূতন করিয়া প্রেমের আনন্দ-ঘন রসে সিক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বীণার প্রথম-জীবনের কৃচ্ছ্র-সাধনা এই বিবাহ দ্বারা অপ্রত্যাশিত ভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। মৃত্যুর পরে সংসার-সিন্ধুর পরপারে গিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার কঠোর বৈধব্য-ব্রত পালনের উদ্দেশ্য। সাধনার সিদ্ধিদাতা ভগবান অচিরেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন—স্বামী-সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহাকে আর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, ইহ জীবনেই তাঁহার স্বামী লাভ হইল। সে আবার যে সে স্বামী নহে—একজন সামান্য কংগ্রেস-কর্ম্মীর পরিবর্ত্তে বিপুল প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গুণবান, ধনবান, আভিজাত্য গৌরব ও সামাজিক মর্য্যাদা সম্পন্ন স্বামী। দেবতার এহেন অযাচিত কৃপাকেই বোধকরি বলা হয় প্রার্থনাতীত দান।

বীণার দুঃখ-কাহিনী বর্ণনাকালে পাঠকও অবশ্য আমাদের সহিত অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আসুন এইবারে নব-পতি গৃহে তাহার সুখময় সংসার-যাত্রা সন্দর্শনে আমাদের সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়কে হাল্‌কা করিয়া লই। আর সঙ্গে সঙ্গে করুণাময় শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি—যে সুখ, যে শান্তি বীণাকে তিনি দিয়াছেন, তাহা অটুট থাকুক। যে হাতের নোয়া, যে সিঁথির সিঁদুর বীণাকে তিনি ফিরাইয়া দিয়াছেন, এবারে তাহা অক্ষয় অব্যয় হইয়া থাকুক। বীরভূম-সীমন্তের যে সম্পদ-বিহীন পল্লীকুটীরখানি বীণার চারুহস্তের স্পর্শ না পাইয়া এতদিনে হতশ্রী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বিশাদ-ঘন স্মৃতি বীণাকে যেন আজ পীড়িত না

করে। দাস-দাসীগণের উপরে হুকুম করিতে গিয়া পল্লীবালার কর্ম্মনিরত দিবসের সহস্রপদচিহ্নাঙ্কিত গৃহ-প্রাঙ্গনখানির কথা আর যেন তাহার স্মৃতিপটে উদিত না হয়। সন্ধ্যাগম হইতে না হইতে ভৃত্য-হস্তে সুরম্য হর্ম্মের কক্ষে কক্ষে বৈদ্যুতিক দীপমালা যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন যেন কল্যাণহস্তে প্রজ্বলিত মৃত্তিকা-প্রদীপের স্তিমিতালোকে উদ্ভাসিত পবিত্র তুলসীমঞ্চ সম্মুখে প্রণামরতা তাপসী-তুল্যা পল্লীবধূর চিত্রটী তাহার চিত্তকে সুদূর সাঁওতাল-পরগণায় লইয়া না যায়। নৈশাহার শেষে সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি দাসী কর্ত্তৃক সযত্ন-রচিত দুগ্ধফেন-শয্যায় স্বামী পার্শ্বে শয়ন করিতে যাইয়া যেন অর্দ্ধাহার ক্লিষ্ট কর্ম্মক্লান্ত পল্লীবিধবার শূন্য শয্যাদর্শনে বিদীর্ণ বক্ষে দারুণ হাহাকারের মর্ম্মন্তুদ চিত্র আর তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়।

উমা দেবী+সত্যেন্দ্র মিত্র

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার যাহা দান, তাহার মধ্যে কলিকাতার নারী-কর্ম্ম-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পুরুষ কর্ম্মিগণ যখন বর্জ্জন-মূলক কার্য্যসমূহ লইয়া ব্যস্ত, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী ও কুমিল্লার নেতা শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের নেত্রীত্বে নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের সদস্যাগণ চরকা ও খদ্দর প্রচারের কাজ বেশ সুনিপুণ ভাবেই করিয়াছিলেন।

মফঃস্বল হইতে যে সকল মহিলা-কর্ম্মী দেশের কাজ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; দেশবন্ধু তাঁহাদের থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করেন। ইহা হইতেই নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের সৃষ্টি। প্রথম উহা দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ভবানীপুরে অবস্থিত ছিল; পরে মধ্য কলিকাতায় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণনগর হইতে এক ব্রাহ্মণ যুবকের স্ত্রী এই সময়ে আসিয়া মহিলা-কর্ম্মিগণের সহিত দেশের কাজ করিবার উদ্দেশ্যে নারী-কর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহারই নাম শ্রীমতী উমা দেবী।

উমা অসামান্যা সুন্দরী। দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে এরূপ সুন্দরী স্ত্রী মানায় না—তাই বুঝি দেশ-মাতৃকার আহ্বান তাঁহাকে ঘর ছাড়াইয়া পথে বাহির করিয়া অবশেষে অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! উমা যখন স্বামী-গৃহ হইতে কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহার স্বামীর ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল না; তিনি এ ব্যাপারে একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে ছাড়াছাড়িরই সূচনা, অদৃষ্টচক্র যে এইখানেই তাহাদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে চিরকালের তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, স্বামী-স্ত্রী কেহই একথা ভাবিতে পারেন নাই। উমা স্বামীকে বলিয়া আসিলেন যে তিনি শীঘ্রই আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন, স্বামী যেন তাঁহার নিকটে নিয়মিত ভাবে চিঠি-পত্রাদি লিখেন...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলিকাতায় আসিয়া উমা মহিলাগণের মধ্যে চরকা ও খদ্দর প্রচার, বাড়ী বাড়ী গিয়া খদ্দর বিক্রয়, মহিলা-সভা ও মহিলা-শোভাযাত্রার উদ্যোগ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি কলেজে না পড়িলেও লেখা-পড়া ভালই জানেন। অহঙ্কারের ভাব তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না—নেত্রীরা যেরূপ আদেশ করিতেন নীরবে পালন করিয়া যাইতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নেত্রীগণের এত প্রিয়পাত্র হইয়া

উঠিলেন যে তাঁহার সুযশ কেবল মহিলাগণের মধ্যে নহে, কংগ্রেসের পুরুষনায়কগণের মধ্যেও প্রচারিত হইয়া পড়িল।

নোয়াখালির বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা, কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌-ভোকেট—অধুনা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্তে হাইকোর্টের প্রাকৃটিশ ছাড়িয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তদবধি কুমার হইলেও সচ্চরিত্র বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তাই নারী-কর্ম্ম-মন্দিরের মেয়েদের গীতার পাঠ দিবার ভার তাঁহার উপরে পড়িল। এই সূত্রেই উমার সহিত তাঁহার পরিচয়।

উমার গুণবত্তার কথা মিত্র মহাশয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি চাক্ষুষ দেখিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উমার ন্যায় সুন্দরী যুবতী ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। প্রথম দর্শনেই মিত্র মহাশয়ের কুমার চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার হইল। অপরাপর মেয়েরা শোভাযাত্রায় বাহির হওয়ায় উমা সেদিন একাই গীতার ক্লাশে উপস্থিত ছিল। সেদিনকার পাঠবস্তু ছিল গীতার তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ বা নিষ্কামকর্ম্ম মাহাত্ম্য বর্ণন। মিত্র মহাশয়ের মুখে নিষ্কাম কর্ম্মের অপরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া উমাও মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

উমা ইহার পরে আরও কয়েকদিন মিত্র মহাশয়ের নিকট একক গীতার পাঠ লইয়াছেন; কোন কোন দিন বা গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে গুরুর মধ্যে একটু চাঞ্চল্যের ভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন নাই। নারী—বিশেষতঃ সুন্দরী সংস্পর্শে পুরুষ মানুষের মধ্যে ওরূপ চাঞ্চল্য যে অপরিহার্য্য এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া উহা উপেক্ষা করিয়া যাওয়াই যে নারীর কর্ত্তব্য, কয়েক মাস কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উমার এজ্ঞান হইয়াছিল। তিনি নড়িয়া চড়িয়া সামান্য একটু সরিয়া বসিলেন মাত্র।

আর একদিনের কথা। সেদিনও নির্জ্জন কক্ষে একমাত্র ছাত্রীকে (বলা বাহুল্য গীতার ক্লাশে আর সকল ছাত্রীই মাঝে মাঝে কামাই করে, একা উমাই করে না) মিত্র মহাশয় গীতার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বুঝাইতেছিলেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ নিসৃতঃ এই ছত্রটীর ব্যাখ্যা কালে গুরুরও মুখারবিন্দ উদ্ভাসিত, চক্ষু-তারকা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝাইতে লাগিলেন যে, "সর্ব্ব ধর্ম্মান্" অর্থ এখানে কেবল সকল শাস্ত্র-সম্মত ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে—লজ্জা, মান, ভয়, ভালমন্দ, সুনীতি-দুর্নীতি প্রমুখ মানুষের যাহা কিছু অহমাত্মিকা বুদ্ধি বা স্বভাব-ধর্ম্ম তাহাই। আর "মামেকং" বলিতেও অপরিজ্ঞেয় পরব্রহ্ম বুঝাইতেছে না; ঈশ্বরের অবতার—মানবরূপী পরমেশ্বর বা মহামানব শ্রীকৃষ্ণই শ্লোকের বক্তা, তাই মামেকং অর্থে তাঁহাকে--অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ মানবকে বুঝাইতেছে। মূল শ্লোকের অর্থ তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, কেহ যদি লজ্জা-মান-ভয় প্রভৃতি মানবের স্বভাব-ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তরমধ্যে আদর্শরূপে গঠিত একজন মানবেরও শরণ লয়, তাহা হইলেও সে সর্ব্বপাপ, সর্ব্ববিঘ্ন সকল আপদ অতিক্রম করিয়া মুক্তির বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে।

ইহার সহিত আসিল মানবধর্ম্মের ব্যাখা—সৃষ্টিতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব—প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর শ্লোক—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে আসিল সহজিয়া সাধন—অকৃত্রিম ও একনিষ্ঠ প্রেম-সাধনায় মানব-মানবীর চিরমুক্তি লাভের কথা!

শুনিয়া উমা মুগ্ধ হইলেন; গীতোক্ত ধর্ম্মের এরূপ অপরূপ ব্যাখ্যা যিনি করিতে পারেন, তিনি যে সাধারণ মানব নহেন—এবিষয়ে তাঁহার

দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল। ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। আত্মপ্রসাদের আনন্দে পরিপূর্ণ চিত্তে গুরুদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

আরও কিছুদিন অতীত হইল। উমার স্বামী—গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া উমার নিকটে পত্র দিলেন ; উমা সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না—কর্ণপাত করিবার উপায়ও ছিল না, তাঁহার দেহমুকুল যে ফলভারে দিনে দিনে অবনত হইয়া পড়িতেছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কথাটা প্রথমে মহিলা-কর্ম্মীদের মধ্যে, পরে নেত্রীদের নিকটেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। নেত্রীরা প্রমাদ গণিলেন, যথাসম্ভব সত্বর উমাকে স্থানান্তরিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। কিন্তু কোথায় লইয়া যাইবেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে ? অবশেষে মিত্র মহাশয়ই করুণাপরবশ হইয়া উমাকে আশ্রয় দিলেন ; তাঁহার জন্য বাসা ঠিক করিয়া তাঁহাকে সেখানে নিয়া রাখিলেন। মহতাশ্রয়ে আসিয়া উমারও মানসিক উদ্বেগ দূর হইল।

যথাসময়ে উমা সুপ্রসব করিলেন। কথাটা লোক-পরম্পরায় উমার স্বামীর কাণে গিয়া পৌছিল। বেচারী এতদিন আশায় আশায় ছিল যে উমা আবার তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার তিন-চারিখানা চিঠির তাগাদায় উমা ইদানীং ক্বচিৎ যে দু'একখানি চিঠি দিতেন, তাহাতেও ঐকথাই থাকিত—"অধীর হইওনা, কাজের চাপ একটু কমিলেই চলিয়া আসিব।"

কিন্তু কাজের চাপ কমিতে না কমিতেই স্ত্রী যে নূতন 'সাফল্য' লাভ করিয়াছেন ব্রাহ্মণ তাহা শুনিলেন। শুনিয়া প্রথমটা বিশ্বাস করিলেন না, শেষে বিশ্বাস করিতে হইল। বুঝিলেন—সুন্দরী যুবতী পত্নীকে দেশ-মাতৃকার সেবায়ও এমন করিয়া একা ছাড়িয়া দিলে স্বামী-সহবাস ব্যতিরেকেও তাহার অপত্য-মাতৃকা হইবার সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রীর আশা তিনি ছাড়িয়া দিলেন। স্ত্রী-জাতির উপরেই তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল, তাই তদবধি তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহারই অনুরোধে আমরা এই আখ্যায়িকায় তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না।

কিছুদিন পৃথক্ বাসায় রাখিয়া অবশেষে নোয়াখালীর জন-নায়ক,

কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্, অধুনা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল, এম্-এল্-এ কৃষ্ণনগরের নিরীহ ব্রাহ্মণ-কুলবধূ শ্রীমতী উমা দেবীকে নিজগৃহে আনিয়া লইলেন এবং তাঁহার সহিত স্বামী-স্ত্রী ভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। লোক-মুখে শুনা যায় যে, মিত্র মহাশয় উমাকে বিবাহ করিয়াছেন। অবশ্য কোন্ রীতিতে কোন্ আইন অনুযায়ী এ বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন হদিস্ পাওয়া যায় না। তবে লোকে এইটুকু বিশ্বাস করে যে ভারতীয় আইন সভার সদস্য—আইনের অন্যতম বিধান-কর্ত্তা শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নিশ্চয়ই বে-আইনী কাজ করেন নাই।

উমা দেবীর নূতন পদবী হইয়াছে উমা মিত্র। মিত্রের মিত্রতা স্বীকার করিবার জন্য যিনি স্বেচ্ছায় দেবীত্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার এই নূতন পদবী স্বীকার করিয়া লইতে জনসাধারণের আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? উমা মিত্র এখন নূতন স্বামীর সঙ্গে কংগ্রেসী মহলে মেলামিশা করেন; পরিষদের অধিবেশন কালে দিল্লী সিমলায় বাস করেন। একবার উমা মিত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর 'কো-অপ্টেড্' সদস্য হইয়াছিলেন; সত্যেন বাবুর সঙ্গেই তিনি কংগ্রেস-কমিটীর সভায় যাইতেন এবং সকলের সহিত মেলামিশা করিতেন, তবে ইদানীং আর তাঁহাকে কংগ্রেসের কাজে ঘেঁসিতে দেখা যায় না। এখন তিনি অনেকগুলি সন্তানের মা হইয়াছেন, তা ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সময় স্বামী সঙ্গে বাইরে বাইরেই থাকিতে হয়—তাঁহার অবসর কোথায়? শুনিয়াছি উমা এখন একান্ত পতিপরায়ণা, তাঁহার ন্যায় সতী-সাধ্বী নাকি বিরল। পর-পুরুষের চিন্তা করা সাধ্বী স্ত্রীলোকের পক্ষে পাপের বলিয়া কৃষ্ণনগরের সেই পত্নী-হারা ব্রাহ্মণের স্মৃতি তিনি মনের মধ্যে একটীবারও উদিত হইতে দেন না।

কংগ্রেসে থাকিলে ব্যবস্থা-পরিষদ্ ছাড়িতে হয় বলিয়া শ্রীযুত মিত্র কংগ্রেসের সম্পর্ক প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা ব্যতীত হরবিলাস সর্দ্দার বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন পাশ হইতে পারিত না। আরও কিছুদিন পরিষদে থাকিবার সুযোগ যদি তিনি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনটাও যে পাশ হইয়া যাইবে সেবিষয়ে আমরা

নিঃসন্দেহ, আর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন-সিদ্ধ হইলে সধবার পুনর্ব্বিবাহও আইন-সিদ্ধ হইবে। শ্রীমতী উমা মিত্রের গর্ভে সত্যেনবাবুর যে-সকল পুত্রকন্যা হইয়াছে, তাহাদের বিবাহে আর আইনের গণ্ডগোল থাকিবে না।

পরিষদের কমিটীসমূহে সদস্যরূপে কাজ করিয়া মিত্র মহাশয়ের কিছু কিছু অর্থ উদ্‌বৃত্ত হয়। কলিকাতা বালীগঞ্জ অঞ্চলে তিনি সম্প্রতি একখানি অট্টালিকা তৈয়েরী করিয়াছেন, ঐ অট্টালিকার নাম দেওয়া হইয়াছে—"উমা-আশ্রম"। এই উমা-আশ্রম বালিগঞ্জ 'লেকের' পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই অঞ্চলটাকেই উপন্যাসকারগণ বাংলার 'বাবু-বৃন্দাবন' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অবশ্য 'উমা-আশ্রম' ইহার অন্তর্গত নহে।

মৃণালিনী সিংহ + নির্ম্মল সেন

কবিত্ব মহার্ঘ বস্তু। মানুষ সব সময় সহজাত ভাবে এই বস্তুটী পায় না, উত্তরাধিকারীসূত্রে তো নহেই। অনেক সময় মানুষকে ইহার জন্য মুল্য দিতে হয়। অবশ্য সে মূল্য কখনও বেশী কখনও কম। শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন অথবা কবি মৃণালিনী সিংহকে ভগবান যে মুল্য গ্রহণে এই কবিত্ব শক্তি দিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। স্বামী ও সংসার-সুখের বিনিময়ে ভগবান তাঁহাকে এই মহার্ঘ বস্তুটী দিয়াছিলেন বলিলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই।

বৈধব্যের পতি-বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় ভগবান তাঁহাকে কবিত্ব-শক্তি দান করেন এবং পুনরায় পতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তির বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

মৃণালিনী ৺ লাড্‌লিমোহন ঘোষের কন্যা। বিদ্যানুরাগী পিতা তাঁহাকে যত্নের সহিত শিক্ষাদান করেন। পিতার প্রদত্ত এই শিক্ষার পরিচয় তাঁহার রচনাবলীর বহুস্থলে পরিস্ফুট। পিতার আর্থিক সংস্থান ও সামাজিক পদমর্য্যাদার সহিত এই শিক্ষার সংযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই পাইকপাড়ার রাজ বাড়ীতে তাঁহার বিবাহ সম্ভাবিত হইয়াছিল।

পাইকপাড়ার ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত মৃণালিনী কিশোর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। বিবাহের অনতিদীর্ঘ কাল পরে যখন তাঁহার স্বামী ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ পরলোক গমন করিলেন, তখন শোকদুঃখে তিনি প্রায় উন্মাদিনী তুল্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দুঃখ বস্তুটী অগ্নি-শিখার মত। দুঃখের বহ্নি মানুষের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হইলে, ইহার দাহিকা শক্তিতে মানব-চিত্তের সকল কলুষ, সকল গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-চিত্ত এই শিখায় প্রজ্বলিত ও আলোকিত হইয়া উঠে। দুঃখের এই অনল-শিখা-বিচ্ছুরিত আলোকেই মানুষের মনে অনেক সময় কবিত্ব-প্রতিভা কিংবা অপরাপর সুকুমার বৃত্তি জাগরুক হয়।

প্রথম শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মৃণালিনী কাব্যচ্ছন্দে মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শোকের যেমন আবেগ আছে, তেমনই ছন্দও আছে। শোকাবেগে কবিতা রচনা করিতে লেখনী ধারণ করিয়াই তাঁহার লেখনী মুখে ছন্দজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিল। এই সময়ে পর পর বহু কবিতা তিনি রচনা করেন এবং 'নির্ঝরিণী', 'প্রতিধ্বনি', 'মনোবীণা' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে ঐগুলি গ্রথিত হইয়াছে।

মৃণালিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩০১ সালে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেন—

"প্রতিধ্বনি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ কবিতাই দুঃখবাদে পরিপূর্ণ। প্রথম জীবনে—যৌবনের প্রারম্ভ কালে কবি যে শোক, যে বেদনা পাইয়াছেন, আপনার প্রিয়তমকে হারাইয়াছেন, প্রত্যেকটী কবিতায় তাহারই অভিব্যক্তি।"

বিধবা হইয়া পঞ্চদশ বৎসর মধ্যে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা করেন, 'প্রতিধ্বনিতে' সেগুলিই প্রকাশিত হয়। তরুণ বৈধব্যে যে কবিত্ব-উৎস উৎসরিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করে এবং পরবৎসর (বংলা ১৩০২ সাল) নির্ঝরিণী ও তাহার পরে মনোবীণা নামক মৃণালিনীর আর দুইখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তবে 'প্রতিধ্বনি' যেমন পতি-বিয়োগ-বিধুরার মানসপটের আলেখ্যে অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী গ্রন্থদ্বয়ে একমাত্র তাহারই পরিচয় পাওয় যায় না। নির্ঝরিণী কতকগুলি ইংরাজী কবিতার অনুবাদেই প্রধাণতঃ পরিপূর্ণ,

এবং মনোবীণায় ঈশ্বরপ্রেম, স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক বহু কবিতাও সংবদ্ধ।

বিধবা হইয়া একদিকে যেমন মৃণালিনী লেখনী মুখে আপনার বৈধব্য-সন্তপ্ত চিত্তের শোকাবেগ কাব্যে প্রকাশ করেন, অপর দিকে তেমনি যথার্থ বিধবা সতীর ন্যায় কঠোর বৈধব্য ব্রত পালন করিতে থাকেন। অন্তরের সমস্ত শোকাবেগ প্রকাশ করিয়া দিয়া আপনার শোক-বিদগ্ধ চিত্তকে কতকটা প্রশমিত করেন।

স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহিত তিনি ঘটনাসূত্রে পরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া মৃণালিনী তাঁহার গলদেশে বর-মাল্য অর্পণ করিয়া রিক্ত আপনাকে পূর্ণ করিয়া তোলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বিবাহিত জীবন সুখের হইয়াছে—দ্বিতীয় স্বামী পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করিয়া তাঁহার চিত্ত আনন্দ-মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু যে বৈধব্য তাঁহাকে কবিত্বশক্তি দিয়াছিল, সেই বৈধব্যের বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীর অন্তর হইতে কবিত্ব-শক্তিও যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। পত্যন্তর গ্রহণের পরে তিনি আর কাব্যচর্চ্চা করেন নাই—কাব্যানুরাগী পাঠক তাঁহার কাব্য-রস-মাধুরী হইতে বঞ্চিত।

প্রতিভা দেবী	}	+	{	জন ম্যাণ্ডার
সুধীরা দেবী	}		{	হেন্‌রী ম্যাণ্ডার

বাংলার নারী প্রগতির ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন সত্য, কিন্তু খাস বিলাতী মেয়েদের সহিত সম-তালে পা ফেলিয়া চলিতে তাঁহাদের ক'জন পারিয়াছেন! যাঁহারা পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় কুচ্‌বিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী সুধীরা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা প্রিয়তায় ইঁহারা কেবল বিলাতী নারীদিগের সমানই হ'ন নাই, তাঁহাদেরও ছাড়াইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

রাণী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর জীবনী পর্য্যালোচনা কালে আমরা কুচ বিহারের সুপ্রসিদ্ধা রাণী—ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বলিয়াছি যে, সুনীতি দেবী যৌবনকালে স্বামীর সহিত বিলাত গিয়া স্বামীর নির্দ্দেশক্রমে বিলাতের অভিজাত গৃহের পুরুষগণের সঙ্গে বলনাচ প্রভৃতিতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্বীয় আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন—"I was thoroughly spoiled much to the delight of my husband."

স্বীয় কন্যাদ্বয়কে অপরিমিত স্বাধীনতা প্রদানে রাণী সুনীতি দেবী কুণ্ঠিতা হ'ন নাই। বিলাতী মহলে যে মেলামেশা তিনি বিবাহের পরে স্বামীর নির্দ্দেশক্রমে করিয়াছেন, সেই মেলামেশা কন্যাদের কুমারী অবস্থাতেই ঘটিয়াছে। বোধ হয় যুগ-ধর্ম্মের কল্যাণে ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়াই কন্যাদের আকাঙ্ক্ষা বিলাতে ইংরাজগণ-মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বল্‌নাচে ও অন্যান্য পার্টিতে যোগদান করিয়া প্রতিভা ও সুধীরার সাহেব বন্ধু জুটিয়াছিল; জন্ ম্যাণ্ডার ও হেন্‌রী ম্যাণ্ডার নামক দুই ধনী ইংরাজের প্রেম এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে ইঁহারা প্রতিভা ও সুধীরার সঙ্গে এদেশে পর্য্যন্ত চলিয়া আসেন। কলিকাতায় প্রতিভা ও সুধীরার সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহ-কার্য্য ব্রাহ্মমতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং ভারতের তদানীন্তন লাট স্বয়ং বহু রাজপুরুষ ও অন্যান্য ইংরাজগণের সহিত এই বিবাহে যোগদান করেন।

বিলাতের ধনী ইংরেজ পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় এদেশের ব্রাহ্ম ব্রহ্মিকাগণ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

ভারতীয় মহিলাগণের পতিভক্তি ও সতীত্ব বিষয়ে যে জগদ্ব্যাপী সুখ্যাতি প্রচারিত, সম্ভবতঃ সেই সুখ্যাতির কথা শুনিয়া উপরোক্ত ইংরাজ ভদ্রলোক-দ্বয় আশা করিয়াছিলেন ভারতের দুই অভিজাত বংশীয়া ধনী-দুহিতাকে তাঁহারা 'একান্ত অনুগত' স্ত্রীরূপে পাইবেন। কিন্তু সে আশায় তাঁহাদের বাজ পড়িল—তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই টের পাইলেন যে, তাঁহাদের স্বামীত্ব 'স্ত্রী'দের তৃপ্তি দিতে পারিতেছেনা।

জন্ ম্যাণ্ডার ও হেন্‌রী ম্যাণ্ডার প্রতিভা ও সুধীরার বিরুদ্ধে নানা-প্রকার কুৎসিত অভিযোগে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করিলেন।

প্রতিভা ও সুধীরা নানাদোষে লিপ্ত রহিয়াছেন প্রমাণিত হওয়ায় আদালত ডাইভোর্স মঞ্জুর করিলেন। সাহেবদ্বয়ের ভারতীয় অভিজাত-কন্যা বিবাহের সখ ঘুচিয়া গেল—প্রতিভা এবং সুধীরাও আর বিবাহ করিলেন না। তদবধি তাঁহারা স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছেন। তবে তাঁহারা আভিজাত্য-গৌরব হারান নাই, অভিজাত ইংরাজ ও উচ্চতন রাজপুরুষগণের মধ্যেই তাঁহাদের মেলামেশা। ভারতীয়গণের সহিত মেলামেশা ইঁহারা অল্পই করিয়া থাকেন—তা তাঁহারা যতই অভিজাত বা প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন হউন।

প্রতিভা ও সুধীরা আজকাল কখনও এদেশে কখনও বা বিদেশে বাস করেন। এদেশে থাকা কালীন কলিকাতা, দিল্লী ও সিমলায় অনেক সময় বাস করেন এবং লাট-বড়লাটের বাড়ীর ভোজ-সভাসমূহে যোগদান করেন। অশ্বারোহণ এবং বিমান-পোতে আরোহণ যেমন বিদেশীনীদিগের বিশেষ প্রলোভনের, এই ভগ্নীদ্বয় ও সেই প্রলোভন হইতে মুক্ত নহেন।

ইঁহাদের দুই ভগ্নীর জ্যেষ্ঠার বিরুদ্ধে আনীত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার রায় প্রদান কালে বিলাতের জজ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমি আজ পর্য্যন্ত ডাইভোর্সের যতগুলি মামলার বিচার করিয়াছি, তাহার কোনটিতেই এরূপ নগ্ন চিত্র আর দেখি নাই।

ভারতবর্ষীয় রাজকুমারীর সঙ্গে সাহেবের বিবাহ যেমন ইহাই প্রথম—রাজকুমারীর বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত।

অরুণা গাঙ্গুলী+আসফ আলি

শ্রীমতী অরুণা গাঙ্গুলী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জামাতা বরিশাল নিবাসী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। অরুণা জুনিয়র ক্যাম্ব্রিজ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁহার সম্পাদনায় "Children's news" নামক একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিদ্যালোচনা ও সাহিত্য-সেবা ব্যতিরেকে তাঁহার আরও একটী গুণ আছে—তিনি স্বদেশানুরাগিণী, দেশের কথা আলোচনায়

তাঁহার অপরিসীম আনন্দ, দেশের কাজে তাঁহার অদম্য উৎসাহ। আইন-অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে তিনি তিনবার জেলে গিয়াছিলেন।

মিঃ আসফ্ আলিও গুণবান এবং ধনাঢ্য যুবক। দিল্লীর তিনি নামজাদা ব্যারিষ্টার। নানাবিধ সদনুষ্ঠানের সহিত যোগ থাকায় তাঁহার ভারত জোড়া নাম-ডাক (ইংরাজীতে যাহাকে বলে All-India-fame) আছে।

এহেন গুণবান্ ব্যক্তির সহিত যখন অরুণা পরিচিতা হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিলেন না। অরুণার গুণগ্রামও আলি সাহেবের অজানা ছিল না। আপনার অন্তরস্থ গভীর প্রেম তিনি অরুণাতে সমর্পণ করিলেন, অরুণাও সানন্দে সেই প্রেমোপচার গ্রহণ করিলেন। দীন ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইছ্লাম কবুল করতঃ প্রেমাস্পদের পাণি-গ্রহণ করিলেন।

অরুণার পিতার ডেরাডুনে এক সাহেবী হোটেল ছিল। কন্যা এলাহাবাদে বেড়াইতে আসেন, মিঃ আসফ আলি তখন কলিকাতায় মোস্লেম লীগে যোগদান করিয়া দিল্লী ফিরিবার পথে এলাহাবাদে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এইখানেই আসফ আলির সহিত অরুণার আলাপ হয়—আলাপের পরেই প্রেম-সঞ্চার এবং তাহার পরেই বিবাহের পাকা কথা-বার্ত্তা; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ 'সংযোজন' বা 'engagement' এর বার্ত্তাটীও ভারতের যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া যায়।

শুনা যায় স্থানীয় হিন্দুরা অরুণার খুল্লতাতকে এই বিবাহ ব্যাপারে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তা ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তিনি সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই।

ইহার কিছুকাল পরে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের ইতিহাসে অরুণা গাঙ্গুলী আসফ আলির বিবাহ শান্তিদাস হুমায়ূন কবিরের বিবাহ অপেক্ষা কোন অংশে স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন নহে।

সুধা চট্টোপাধ্যায় + আলেকজাণ্ডার বেনোয়া

কলিকাতা সিটী কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের ন্যায় ভাগ্যবান্ কে? তাঁহার আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ চারিদিক হইতেই স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আবার এই সেদিন তাহার শ্যালিকা শ্রীমতী সুধা চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের গৌরব-শিখরে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষকে প্রগতির পথে আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীমতী সুধার ন্যায় সুশীলা ও বিদ্যানুরাগিণী তরুণী অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যানুরাগ প্রবল দেখিয়া মৈত্র মহাশয়ের উপদেশই বোধ হয় সুধার স্বজনবর্গ সুধাকে শান্তি-নিকেতনে প্রেরণ করেন। মৈত্র মহাশয়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বালিকা শিক্ষালয়ে না দিয়া সুধাকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিবার কারণ বোধ করি এই যে, ব্রাহ্ম-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ে অদ্যাপি সহ-শিক্ষা বা স্ত্রী-পুরুষকে একত্রে শিক্ষাদানের মহৎ প্রথা প্রচলিত হয় নাই, আর শান্তিনিকেতনে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকায় সুধার তরুণী-চিত্তের সম্প্রসারণ দ্রুততর হইবে। যাহাহৌক্ সুধা শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হইল এবং স্বীয় গুণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল শ্রীযুত আলেক্জাণ্ডার বেনোয়া নামক তথাকার এক সুইজ্ অধ্যাপকের দৃষ্টি। বেনোয়া সাহেব সুধার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় তাহার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিতেন। তিনিও অন্যান্য অধ্যাপক অপেক্ষা এই সরলপ্রাণ বিদেশী অধ্যাপককেই শ্রদ্ধা করিতেন।

বেনোয়া সাহেবের সহিত তাহার শ্রদ্ধার ভাব দেখা যাইতে লাগিল। উভয়ের জ্ঞান-পিপাসা প্রবল ছিল, শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে দুইজনে নানাবিষয়ে আলোচনা করিতেন।

অবশেষে এক শুভদিনে শান্তিনিকেতনের শালবনের শ্যামল ছায়াতলে সুধা বেনোয়া সাহেবের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই

বিবাহে আশ্রমস্থ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই আন্তরিক সুখী হইলেন—কারণ সুধা যেমন সকলের স্নেহের পাত্রী ছিল, সরলপ্রাণ ও মিষ্টভাষী বেনোয়া সাহেবও তেমনি সুদূর সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী হইলেও ছাত্র-ছাত্রীগণের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া যেন তাহাদের আপনার জন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রম-বালিকারা সুধার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

ঋষি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—প্রাচীন কালের তপোবনের আদর্শে শান্তি-নিকেতন গঠিত। গুরুদেবের আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই এজন্য আমরাও আনন্দিত।

ললিতা রায় + ম্যাট্‌ল্যাণ্ড

শ্রীমতী ললিতা রায় স্বনামখ্যাত মিঃ পি কে রায়ের কন্যা। বিদ্যার্জ্জন ও বিলাতী সমাজের হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে জাহাজে তিনি দেশে ফিরিতেছিলেন।

মিঃ ম্যাট্‌ল্যাণ্ড (আই-সি-এস্) ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী। যে জাহাজে ললিতা ছিলেন, ম্যাট্‌ল্যাণ্ডও সেই জাহাজেই কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। জাহাজে ললিতার সহিত তাঁহার আলাপ হয়। প্রথমালাপেই উভয়ে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে পরস্পরের প্রতি প্রেমসঞ্চার হয়।

দিগন্তবিস্তৃত সাগর-বক্ষে সঞ্জাত সেই প্রেমের পরিধি ছিল বুঝি সাগরেরই মত অসীম, অনন্ত, অগাধ। নূতন প্রেমিক-প্রেমিকার দিনগুলি জাহাজে মন্দ কাটিল না—দিনের পর দিন ডেকের উন্মুক্ত বায়ুতে দুইটী প্রেমিক-প্রেমিকার সেই বিশ্রম্ভালাপ, অবসর সময়ে মিঃ ম্যাট্‌ল্যাণ্ডের কেবিনে যাতায়াত, প্রেমের এ যেন এক নূতন মূর্ত্তি। জাহাজে বসিয়াই মিঃ ম্যাট্‌ল্যাণ্ড ললিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন—ললিতা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

কার্য্যক্ষেত্রেও অনুরূপ হইল না। ভারতে ফিরিয়াই তাঁহারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ললিতা ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন—রাখিয়া গিয়াছেন আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের এক মহীয়ান্ আদর্শ।

মাতুল কন্যা + অতুলপ্রসাদ সেন

শ্রীযুত অতুলপ্রসাদ সেন স্যার কে জি গুপ্তের ভাগিনেয়। মাতুল এবং ভাগিনেয় উভয়েই কৃতী—মামা আই সি এস, ভাগিনেয় ব্যারীষ্টার।

বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিবার পর যখন অতুল-প্রসাদের বিবাহের কথা উঠিল, তিনি বলিয়া বসিলেন—বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে বিবাহ-যোগ্যা পাত্রী কোথায় যে বিবাহ করিব?

স্যার কে জি গুপ্তের অনূঢ়া তরুণী কন্যা কাছে ছিলেন, তিনি বলিলেন—সেকি অতুলদা, বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে তোমার বৌ হবার যোগ্য একজনও খুঁজে পাওনা? আমরা কি এতই হেয়?

মাতাত বোনের এ তেজস্বিতাপূর্ণ প্রশ্নে অতুলপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন—কহিলেন—তোর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সে তো আর হ'বার নয়!

অতুল-প্রসাদ দেখিলেন, খুকীর চোখে আনন্দের দীপ্তি। 'খুকী' দেখিল কোথায় কোন্ অচেনা ঘরে গিয়া পড়িবে, তাহার চাইতে অতুলদা' মন্দ কি? পিসি-মাও তো তাহাকে খুবই ভালো বাসেন—কোন রায়-বাঘিনী শাশুড়ীর খপ্পরে গিয়া পড়িতে হইবে না।

দুইজনার মধ্যে গাঢ় প্রেম ছিল এখন বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে ভাবিয়া অতুলপ্রসাদ 'বোন্‌টীকে' লইয়া বিলাতে গেলেন, সেখানে বসিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল।

ভাই-বোনের এই বিবাহ শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু টিকে নাই—দু'জনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু-পত্নী + ডাঃ দয়াল গুহঠাকুরতা

ডাঃ দয়াল গুহ ঠাকুরতা পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। এম্ এ পাশ করিয়া তিনি বিলাত গমন করেন এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় থিসিস্ রচনা করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি এইচ্ ডি উপাধি লাভ করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ লাহোরে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হ'ন।

ঐ কলেজেরই এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের সহিত দয়ালের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। উক্ত অধ্যাপকের শিক্ষিতা ও সুন্দরী পত্নী অতিথি-সৎকারার্থ তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতেন এবং কখনও স্বামীর উপস্থিতিতে কখনও বা অনুপস্থিতিতে স্বামীর বন্ধুকে সুমিষ্ট আলাপে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু দয়াল আর বন্ধুগৃহে কতক্ষণ থাকেন—পরিতৃপ্ত মিষ্টালাপের পক্ষে ঐ সময়টুকু যে নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত। মহিলাটী একদিন স্বামীকে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দয়ালের সহিত বাস করিবার সাধু-সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন! স্বামী বেচারী পূর্ব্বেই হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। ছাত্র-শাসনে যতই পটু হৌন, স্ত্রী-শাসনে তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার উপর শিক্ষিতা ও সুন্দরী পত্নীকে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতাই দিয়াছিলেন এবং এই স্বাধীনতার মন্ত্রে নিজেই তাহাকে দীক্ষিতা করিয়াছেন। তিনি আপত্তি করিলেন না, বোধ করি মনে করিয়াছিলেন—যে পাখীর পাখা হইয়াছে, আপত্তি করিলেও সে উড়িবেই।

বন্ধু-পত্নী আসিয়া দয়ালের গৃহিণী হীন গৃহখানি অলঙ্কৃত করিলেন। কথাটা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের কাণে গেল। চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া দয়ালকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। প্রেমময়ী বন্ধু-পত্নীকেও তিনি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বন্ধু পত্নী ঐ সময় দুটী সন্তানের জননী, অপত্য স্নেহ তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না—উহাদের ফেলিয়াই চলিয়া আসিলেন।

দয়াল তখনও বিবাহ করেন নাই। বন্ধুর স্থান পূর্ণ করিয়া বন্ধু-পত্নীকে লইয়া তিনি 'কুটীর' বাঁধিলেন।

কৈবর্ত্ত বালিকা + অধ্যাপক সুশীল মৈত্র

ডাঃ সুশীলচন্দ্র মৈত্র এম-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এথিক্সের প্রফেসর ও ফিলসফির লেক্‌চারার। শ্রীরাম পুরে তাঁহার বাড়ী, কুলীন ব্রাহ্মণ।

বি-এ পাশ করিবার পর ডাঃ মৈত্র এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে কন্যার পিতা ডাঃ মৈত্রকে যথেষ্ট যৌতুক ও নগদ অর্থ দিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের কয়েকটি সন্তান ও হইয়াছে। ডাঃ মৈত্রের বর্ত্তমান বয়স প্রায় ৪২।৪৩ বৎসর।

ডাঃ মৈত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী উপলক্ষে স-স্ত্রীক কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার ভাড়াটিয়া বাড়ীর সম্মুখে এক কৈবর্ত্ত পরিবার বাস করিত। ঐ পরিবারে একটী অবিবাহিতা তরুণী ছিল। প্রতিবেশী তরুণী অনেক সময় মৈত্রের বাড়ী আসিত। মৈত্রের স্ত্রী এই তরুণীর হাবভাব পছন্দ করিতেন না। তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীতে বেশ একটা প্রেম-কুন্দল হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে ডাঃ মৈত্র অদৃশ্য হইলেন। মৈত্র কলেজে উপস্থিত হন কিন্তু স্ত্রী যে বাড়ীতে থাকেন ঐ বাড়ীতে আসেন না। মৈত্রের স্ত্রী শিশু পুত্র কন্যাদের লইয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই ভাবে কয়েক মাস চলিয়া গেল। মৈত্রের স্ত্রীর সংসার খরচেরও অভাব হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে স্বামীর খোঁজ করিয়া দিতে একখানা দরখাস্ত পাঠাইলেন।

এই সময় অন্য একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক সম্বন্ধে গোপন তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ডাঃ মৈত্র তাঁহার স্ত্রীর আবেদনের বিষয় অবগত হইয়া প্রমাদ গণিলেন। যে কোন কারণেই কর্ত্তৃপক্ষ বিরূপ হইলে চাকরীর মায়া যে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। ডাঃ মৈত্র অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। তদন্ত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই অধ্যাপক বড়ুয়ার সাহায্যে ডাঃ

মৈত্র এক যুবতীকে বৌদ্ধমতে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পরে দেখা গেল যে, এই সেই কৈবর্ত্ত কন্যা—যে ডাঃ মৈত্রের বাড়ী যাতায়াত করিত।

পরে জানা গিয়াছিল যে ডাঃ মৈত্র পূর্ব্ব স্ত্রীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া কাশিপুর অঞ্চলে বাস করিতেন—অবশ্য এই তরুণী কোথায় থাকিত তাহা কেহ বলিতে পারে না।

ডাঃ মৈত্রের প্রথমা হিন্দু স্ত্রী পুত্র-কন্যাসহ শ্রীরামপুরে বাস করেন। তাঁহার বৌদ্ধ স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কলিকাতা থাকেন।

ডাঃ মৈত্র 'মেণ্টাল' ও 'মরাল্' দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। ছাত্রগণের মধ্যে অনেক ছাত্রীও তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রীরা সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, কৈবর্ত্ত জাতিয়া কেহ নাই।

এই কৈবর্ত্ত কন্যাকে বিবাহাভিনয়ে আইনের গণ্ডিতে টানিয়া আনিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেক অধ্যাপকের অনুকরণ যোগ্য।

রাধারাণী দত্ত+নরেন্দ্র দেব

শ্রীমতী রাধারাণী বাংলা ১৩১১ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে কোচবিহার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ ঐ সময়ে কোচবিহারের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। জন্ম হইতে কৈশোরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাধারাণী কোচবিহারেই বাস করিয়াছেন।

লেখাপড়ায় রাধারাণীর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং বাড়ীতেও গৃহশিক্ষক রাখেন। বালিকাও মন দিয়া পড়াশুনা করিয়া লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। বাল্যকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি রাধারাণীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা কবিতা পাঠ করিতে তিনি সমধিক আগ্রহান্বিতা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পদ্য মিলাইতে অভ্যাস করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাধারাণীকে লেখাপড়া করিতে হইল না। কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রাধারাণীর পিতা তাঁহার বিবাহ দেন। রামপুর

রাজ্যের ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত রাধারাণীর বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে স্বাস্থ্যবান, উপার্জনক্ষম ও উচ্চশিক্ষিত পাত্র পাইয়া আশুতোষ আর দ্বিধা করিলেন না। রাধারাণীর এই বিবাহে মত ছিল না; পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আশুবাবু কন্যার কথা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে পত্নীকে তিনি আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সময় ছিল না। দুরন্ত রোগে সত্যেন্দ্রনাথ ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার আকস্মিক বৈধব্যে স্বজনবর্গ সকলেই শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পুত্রশোকাতুরা শ্বাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাধারাণী তাঁহার কাছে রহিলেন। শাশুড়ীও বধূকে কোলে করিয়া নিদারুণ পুত্রশোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন। স্বামীর আত্মীয় ও প্রিয়জনদিগের সেবা করিয়াই সুশীলা বালিকার দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের স্বজনবর্গ সকলেই বালবিধবা রাধারাণীর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাধারাণী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সুদৃঢ় আপত্তিতে পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ করিতে কেহ সাহসী হইলেন না। সারল্য ও শুচিতা রাধারাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য। বিধবা হইবার পরে এই শুচিতা আরও বাড়িয়া উঠিল। ফলে বিধবা হইলেও তাঁহাতে যেন কুমারী-সুলভ পবিত্রতা ও নির্ম্মলতায় ঘিরিয়া রাখিল।

কয়েক বৎসর পরে আত্মীয় স্বজনের সহিত রাধারাণী কলিকাতায় আসিলেন। এই সময়ে সম্পর্কীয় ভ্রাতা শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ ঘটিল। নরেন্দ্র ও রাধারাণীর মধ্যকার পূর্ব্ব-সম্পর্কটী যে সঠীক কি—মাসতুতো না পিসতুতো ভাইবোন, সে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম না। তবে তাঁহারা যে ভাইবোন (cousin) ছিলেন, একথা নরেন বাবু হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। কারণ, রাধারাণীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে সম্পাদিত কাব্য-সংগ্রহগ্রন্থ কাব্য-দীপালির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উহার সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব

লিখিয়াছেন—"এই বিরাট কার্য্য সম্পাদন আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠ্‌তো যদি না আমার স্নেহাস্পদা অনুজা শ্রীমতী রাধারাণী দত্তও এসে আমার সঙ্গে কোমড় বেঁধে না লাগ্‌তো।" অনুজা বলিতে সাধারণতঃ সহোদরা ভগ্নীই বুঝায়; তবে নরেনবাবু নিশ্চয়ই শব্দটী সে অর্থে ব্যবহার না করিয়া cousin অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে একথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নরেন বাবু নিজেও কবি। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া রাধারাণীর কবিতা-শক্তি বিকশিত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা হইল প্রচারের। মাসিক পত্র "ভারতবর্ষ" সম্পাদনায় নরেনবাবু উহার সম্পাদক রায় শ্রীযুত জলধর সেন বাহাদুরকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া থাকেন। বাংলা ১৩৩০ সালে রাধারাণীর কবিতা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইল। তৎপরে মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি মাসিক-পত্রেও রাধারাণীর কবিতা প্রকাশিত হইতে দেখা গেল। প্রকাশের সুযোগ পাইয়া রাধারাণীও অধিকতর উৎসাহে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণীর বৈধব্য-জীবনের দুঃখ-বেদনা তাঁহার কাব্যে সকরুণরূপে ফুটিয়া উঠিত—

"মধুর ধ্যানের বসে বিচ্ছেদের শূন্য পাত্রে মম
লইয়াছি ভরি.
অন্তরের হাসি তাই অশ্রু যুথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি!
তোমার বিরহ মোর কামনা পঙ্কের মাঝে প্রিয়,
ফুটিয়াছে ফুল—"

এখন তাহাতে সান্ত্বনার ভাব দেখা গেল—

আমার এ রিক্ত প্রাণে পরম পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্ব সুখী,
তুমি বাসিয়াছ ভালো, আর কোন দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুঃখী!
তুমি বাসিয়াছ ভালো, তুমি ভাল বাসিয়াছ বঁধু,
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি উথলি উঠে মধু,
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ ধূপে পরিণত আজি
উর্দ্ধ অভিমুখী

অন্তরের পরিপূর্ণতা বুঝি বাহিরকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারেনা—মিলন অন্তরের ও বাহিরের। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা অভিনব কাব্যরূপ হইয়া দেখা দিল—

"উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহমনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য ছুরে, অধরে অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের চর্ম্মগন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল;
জীবনের অন্ধবীজ অঙ্কুরেতে পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল।"

হৃদয়ের গোপন-কামনা কি চমৎকার অভিব্যক্ত - "জীবনের অন্ধবীজ অঙ্কুরেতে পরিণতি মাগে।"

রাধারাণীর এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়া লীলা-কমল নামে কাব্যগ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হইল। তিনি যে আধুনিক বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

দুঃখবাদের উপরে লীলাকমলের ভিত্তি কিন্তু সেই দুঃখবাদ প্রথম অস্পষ্ট —পরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবকে তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া cousin-বিবাহের সমর্থন করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া "খেলার পুতুল ও "যাদুঘর" নামক বই দু'খানিতে তিনি নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া cousin-বিবাহ সমর্থন করাইয়াছেন, তাঁহার যাদুঘর হইতে দু'একটী অংশ আমরা এস্থলে উদ্‌ধৃত করিব—

ভোলানাথ উমার পিস্‌তুত ভাই আর প্রকাশ উমার দাদা। প্রকাশ উমাকে বলিতেছে :—

'পৃথিবীর আর সব দেশের মতো আমাদের সমাজেও যদি cousin-marriageটা প্রচলিত থাক্‌ত, তাহ'লে এই ভোলাটা যতই idiot হোক্, ওর সঙ্গে আমি নিশ্চয় তোর বিয়ে দিতুম!"

আর এক যায়গায় ভোলানাথ প্রকাশকে বলিতেছে—

"কিন্তু উমা না আমার বোন? ওকে তুমি আমার সম্বন্ধে আমরই সামনে যে-সব ঠাট্টা করো—most objectionable and very bad taste too!—"

ইহার উত্তরে প্রকাশ বলিতেছে :—"Nonsense! cousins are always the best of friends. তুই অতো ক্ষেপে উঠিস্ কেন? কই উমি তো রাগ করে না!"

এই যাদুঘর উপন্যাসখানি প্রথমে অধুনা-লুপ্ত মাসিকপত্র কল্লোলে প্রকাশিত হইয়াছিল। "cousins are always the best of friends" এই বাক্যটী কল্লোল হইতে রূপান্তরিত হইয়া গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে; কল্লোলে ছিল—"cousins are always the best targets." কথটা লইয়া তখন চারিদিকে টি টি পড়িয়া গিয়াছিল। রাধারাণীর সহিত নরেনবাবুর সম্পর্কের কথাটা লোকের জানা ছিল, তাই একটা গুজবও রটনা হইয়াছিল—নরেন দেব রাধারাণী দত্তকে বিবাহ করিবেন। কিছুদিন পরে কাব্য-দীপালিতে নরেনবাবুর স্বহস্তে লেখা "স্নেহাস্পদ অনুজা শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত" কথাটী দেখিয়া লোকের মন হইতে সে ধারণা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

নরেনবাবুর দুইজন অগ্রজ বিবাহ করেন নাই, তিনি নিজেও যৌবনের প্রায় বারো আনা কাল অবিবাহিত অবস্থায়ই অতিক্রম করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনিও যে তাঁহার অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় চিরকুমার অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দিবেন, লোকের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হওয়াই স্বাভাবিক; হইয়াছিলও তাহাই। রাধারাণীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কাব্য-চর্চ্চার সহযোগিতার সম্পর্ক—ইহাতে কখনও আবিলতা দেখা দেয় নাই। তাহার উপর নরেনবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রাধারাণীর বয়স সাতাশ। তবে যে বস্তুটীর মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে বস্তুটী কাব্য-চর্চ্চা—অন্তরের কোমলতম তন্ত্রীটীতে যাহা আঘাত করে। কাব্য-জগতে সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব-জীবনেও সহযোগিতার জন্য দুইজনে প্রস্তুত হইলেন।

একদিন সংবাদপত্রসমূহের মারফৎ প্রচারিত হইল—শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী পরস্পরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। তারপর বাংলা ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পবিত্র রজনীতে লিলুয়ার বাগান বাড়ীতে বহু বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের উপস্থিতিতে কবি-যুগলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। বরের পক্ষে বরের অগ্রজগণ উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপক্ষীয় কেহ উপস্থিত না থাকায় রায় শ্রীযুত

জলধর সেন বাহাদুর কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান্ বিশুদ্ধ হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্ব্বিবাহের পরে রাধারাণীর কাব্য-চর্চ্চা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহের পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে তিনি যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন এয়োতির চিহ্ন সিঁথিমৌড়ের সুন্দর অনুকৃতি যুক্ত প্রচ্ছদপটে শোভিত হইয়া "সিঁথিমৌর" নামে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবাহে যে তিনি সুখী হইয়াছেন, তাঁহার অতৃপ্ত অশান্ত আত্মা যে ইহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া—সিঁথিমৌড়ের বহু কবিতায় এরূপ আভাস পাওয়া যায়। কোন সখীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"দুঃখই দেখেছ শুধু, কিন্তু দেখ নাই
পেয়েছি ঐশ্বর্য্য কিবা দুঃখসিন্ধু ছানি।
পঙ্কই দেখিতে পেলে! পেলে শুধু গ্লানি
ফুটেছে পঙ্কজ তাহে দেখিলে না ভাই!"

আর একটী কবিতায় তিনি আপশোষ করিয়া বলিয়াছেন—

"কেহ বা শাপিয়া কহে—"কেন মরিলে না?
এত শিক্ষাদীক্ষা তার এই পরিণাম?"

* * * * *

জীবন-মালঞ্চ মম পত্রপুষ্পহীন
ছিল শুষ্ক শূন্য মরু দীর্ঘযুগ ধরি!
অসার নিন্দার সার পড়েছে যেদিন
ফুলে ও ফসলে সে যে উঠিয়াছে ভরি!"

ঐ সিঁথিমৌড়েরই আর একটী কবিতায় প্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

"তুমি এসে দাঁড়াইলে চিত্তদ্বারে মম
মর্ম্মে আঁকা রূপরেখা মূর্ত্ত হল যেন
প্রাণ চেতনার মন্ত্রস্পর্শে,—প্রিয়তম!
বিস্ময়ে কহিনু—"ওগো, মোর দ্বারে কেন
দাঁড়ালে অতিথি হয়ে? কিছুই তো নাই
মোর চির-শূন্য বুকে;—কহেছিলে হেসে,
"শূন্যতাই দাও তুমি, তাই লয়ে যাই,
রিক্ত করে ফিরিব না তব দ্বারে এসে!"

তাঁহার এই সিঁথিমৌড় অক্ষয় হোক।

কল্পনা সেন + নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার নাট্য-মহলে এক যুগবিপ্লব আনয়নকারী পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল নাট্যনিকেতনে—মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব সহকারী আর্ট-ডাইরেক্টর শ্রীযুত সতু সেন এই পরিবর্ত্তনের সূচনা করেন। নাট্য-নির্ব্বাচন, মঞ্চসজ্জা, প্রযোজনা ও অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে পাশ্চাত্যের অনুরূপ করিয়া তোলাই ছিল পরিবর্ত্তন সাধনকারীদের প্রাধান উদ্দেশ্য। তদনুরূপ নাটক চাই—প্রগতি-পন্থী নাট্যকার শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেন "ঝড়ের রাতে" নামক নাটকে সধবার পর-পুরুষাশক্তিকে প্রধান বিষয়-বস্তু করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেইখানিই অভিনয়ের জন্য মনোনীত হইল।

নাটকের প্রধান ভূমিকা অভিনয়ের ভার পাইলেন প্রতিভাবান নট শ্রীযুত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

সর্ব্বপ্রকারে নব-যুগের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট হইল। রঙ্গালয়ের একজন কর্ম্মকর্ত্তা স্বীয় পরিবারস্থ ও আত্মীয় মহিলাদিগকে রঙ্গালয়ে আনিয়া সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন; গ্রে ষ্ট্রীটের জনৈক কবিরাজের কুমারী কন্যা শ্রীমতী কল্পনা সেন ইঁহাদের অন্যতম। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সহিত এই সূত্রে কল্পনার পরিচয় ঘটিল।

ইহার প্রায় একবৎসর পরে 'রঙ্মহল' থিয়েটারে 'অসবর্ণা' নামক একখানি নাটক অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইল। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তখন নাট্যনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া রঙ্মহলে আসিয়াছেন। অসবর্ণায় নায়কের ভূমিকা অভিনয়ের ভার তাঁহার উপরে পড়িল।

অসবর্ণার যখন মহলা চলিতেছে, সেই সময়ে একদিন (বাংলা ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে) সংবাদপত্রসমূহে দেখা গেল পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুত সতু সেনের (ইনিও তখন রঙ্মহলের অধ্যক্ষ) বাড়ীতে বৈদ্যকন্যা শ্রীমতী কল্পনার সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীযুত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অসবর্ণ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইহার দিন কুড়ি পঁচিশ পরে কলিকাতার কোন সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে

একটী সংবাদ প্রকাশিত হইল যে অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নবোঢ়া পত্নী নির্ব্বিঘ্নে একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে আমরা লাহিড়ীর পত্নীর আসল নামটী গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিলাম। কন্যার পিতার নামও ঐ কারণেই গোপন রাখিলাম।

পারুল লাহিড়ী + সুনীল লাহিড়ী

শ্রীমতী পারুল লাহিড়ীর বাড়ী বরাহনগর। জ্ঞাতি কাকা (একই বাড়ীর) সুনীল লাহিড়ীকে শৈশব হইতে তাহার ভাল লাগিত। কতবার সে কাকার কোলে পিঠে উঠিয়াছে, কত আব্দারইনা তাহার কাছে করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও কাকার প্রতি সেই আকর্ষণ তাহার দূর হয় নাই, কাকারও ঠিক তাহাই। খুল্লতাত আর ভাইঝি দু'জনেই দু'জনের মনের কথা বুঝিয়া বিবাহ করেন নাই—আত্মীয়-স্বজনবর্গ বিবাহের আয়োজন করিলেও আপনাদের সঙ্কল্প অটুট রাখিয়াছেন।

ক্রমে পারুল পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইল। স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল; তখন সে নিজেকে স্বাধীন বিবেচনা করিল। কাকার কাছে একদিন কথাটা পাড়িল।

কাকাও এই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি বিবাহের আয়োজন করিলেন। পাঁজি দেখিয়া শুভদিন বাছিয়া শাস্ত্রানুগত হিন্দু সংস্কার ও বিশুদ্ধ হিন্দু আচার অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল না। জন্মাবধি যাহার সহিত লক্ষবার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়াছে, তাহার সহিত পারুলের শুভদৃষ্টি হইল। দিদিমা শাশুড়ী সাজিয়া শাঁখা-সিঁদুরে নাতনীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইলেন।

হাসান আরা আজিজ + কানাইয়ালাল গৌবা

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু-নারীকে বিবাহের দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দুর মুসলমান নারীকে বিবাহের নজীর অতি অল্পই মিলে। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় পাঠক দেখিবেন পাঞ্জাবের এক উচ্চ-শিক্ষিত ধনী-পুত্র এক বাঙ্গালী মুসলমান ব্যারীষ্টারের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

মিঃ আবদুল আজিজ আহম্মদের পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমানে। তিনি লক্ষ্ণৌয়ে ব্যারীষ্টারী করেন। শ্রীমতী হাসান আরা আজিজ তাঁহারই কন্যা।

মিঃ কানাইয়ালাল গৌবা সুপ্রসিদ্ধ ধনী লালা হরকিষণলালের পুত্র। তিনিও ব্যারীষ্টার এবং সুপ্রসিদ্ধ "সাণ্ডে টাইমস্" নামক পত্রিকার সম্পাদক।

সম-ব্যবসায়ী আজিজ আহাম্মদের সহিত মিঃ গৌবার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। এই সূত্রে তিনি আজিজ আহাম্মদের কন্যা হাসান আরার সহিত পরিচিত হ'ন। বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাময়ী তরুণী হাসান আরাকে তাঁহার ভাল লাগে; হাসান আরাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হ'ন।

এক শুভদিনে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইল। কানাইয়ালাল আর হাসান আরা পরস্পরকে জীবন-সঙ্গিনী ও জীবন-সঙ্গীরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। পবিত্র প্রেমের স্বর্গীয় মাধুর্য্যে এক সুখময় আন্তর্জ্জাতিক সংসারের প্রতিষ্ঠা হইল।

সুশীলা বাগ্‌চী বি-এ, বি-টি + মোটর ড্রাইভার

সুশীলা বাগ্‌চী সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কন্যা; তাঁহার এক ভ্রাতা মুন্সেফ। বি এ এবং বি টি ডিগ্রী লাভ করিয়া সুশীলা গিরিডি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করে। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল বিবাহ করিবেন না, চিরকুমারী থাকিয়া মেয়েদের শিক্ষাদান করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিবেন।

কিন্তু নিজের ভবিতব্যের উপরে তো আর মানুষের হাত নাই! যে অনঙ্গদেবের কৃপায় রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই অনঙ্গদেবেরই অভিপ্রায়ে সুশীলাকেও কৌমার্য্য-ব্রত পরিত্যাগ করিতে হইল। গিরিডিরই এক মোটর ড্রাইভার তাঁহার চরণে প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিল—করুণাপরবশ হইয়া সুশীলাও ভক্তপ্রদত্ত সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন।

পরিণত বয়সে ঘোমটা দিয়া বধূটী সাজিয়া যখন তিনি স্বামী-গৃহে প্রবেশ করিলেন, লোকের মনে হইল—বুঝিবা দেবীচৌধুরাণী প্রফুল্ল সাজিয়া ব্রজেশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিতেছে। দিবা ও নিশির কার্য্যটা নাকি তাঁহার সহ-শিক্ষয়িত্রীরাই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সুশীলা আজ ইহজগতে নাই। কিন্তু যে মোটর-ড্রাইভার ড্রাইভারের আসন পরিত্যাগ করিয়া একটী প্রেমময়ী নারীর হৃদয়-আসনে গিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, পুনরায় মোটর চালাইতে গিয়া আজিও তাহার চক্ষু দুটী সুশীলার প্রেমময় স্মৃতিতে অশ্রুবাষ্পাকুল হইয়া উঠে।

শান্তি নিয়োগী+ডাঃ অমলেশ

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহ নিয়োগী মৈমনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত শাঁকৃরাইলের জমীদার। শ্রীমতী শান্তি তাঁহারই কন্যা। দেশের কাজে তাহার গভীর অনুরাগ; টাঙ্গাইল সহর শাঁকৃরাইল হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত—ছড়ি হাতে রোজ সে পায়ে হাঁটিয়া এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া টাঙ্গাইল যাইত এবং তথাকার নারী-সত্যাগ্রহ সমিতির কাজ করিয়া শাঁকৃরাইল ফিরিত। টাঙ্গাইল নারী-সত্যাগ্রহ-সমিতির সেই ছিল নায়িকা।

বীরেনবাবু নিজ গ্রামে একটী দাতাব্য ঔষধালয় খুলিলেন। উহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন। ডাক্তারখানাটীর পরিচালনা ভার জিলাবোর্ডের উপর ন্যস্ত। জিলা-বোর্ড অমলেশকে ঐ ডাক্তারখানার ডাক্তার নিযুক্ত করেন। অমলেশ ডাক্তার বীরেনবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারখানার কার্য্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার যুবক, বয়স ত্রিশের উপরে নহে। শান্তিও উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স্কা যুবতী। দুইজনেই শিক্ষিত, দুইজনেই দেখিতে সুন্দর। এক্ষেত্রে যাহা ইটিবার তাহাই ঘটিল—শান্তি অমলেশ ডাক্তারকে বিবাহ করিতে চাহিল। অমলেশেরও এবিষয়ে মতান্তর দেখা গেল না।

কিন্তু গোড়াতেই গলদ—শান্তি জাতিতে বৈদ্য, অমলেশ কায়স্থ। শান্তির বাবা একটু উদার মতালম্বী ছিলেন, হাঁ না করিয়া তিনি একপ্রকার মতই দিলেন। কিন্তু শান্তির মা বাঁকিয়া বসিলেন—কায়স্থর ছেলেকে মেয়ে দিয়া তিনি কি শেষে জাত-ধর্ম্ম খোয়াইবেন ?

শেষে কিন্তু মেয়ের ইচ্ছাই জয়লাভ করিল—বিরেন সিংহ অমলেশকেই কন্যাদানে উদ্যত হইলেন। তবে তিনি নির্ব্বিঘ্নে কন্যাদান করিতে পারিলেন না ; ঘারিন্দার মজুমদার গোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী বৈদ্যেরা বিবাহে বাধা জন্মাইল।

এই সময় সদর হইতে টেলিগ্রামে অমলেশের প্রতি বদলীর আদেশ হইল, অমলেশ ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন।

বীরেনবাবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনিও কন্যাসহ ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন। শাঁকরাইল হইতে কতক যুবক ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না—

অমলেশের সহিত শান্তির বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। এই বিবাহে তাহারা সুখী হইয়াছে, যৌবনের প্রেমস্বপ্ন সফল হওয়ায় তাঁহাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

কঙ্কাবতী শিশির ভাদুড়ী

শ্রীমতী কঙ্কাবতীর নাম আজ নাট্যামোদিগণের নিকট সুপরিচিতা হইলেও তিনি আবাল্য রঙ্গালয়ের আব্‌হাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হ'ন নাই।

কঙ্কাবতী বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবিনী ছাত্রী ছিলেন। বেথুন স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া তিনি বেথুন কলেজেই আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন কলেজে পড়িবার পর তাঁহার অভিভাবকগণের সহিত কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন বিষয় লইয়া

মতান্তর উপস্থিত হইলে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলেজ ছাড়িতে বাধ্য হ'ন। অতঃপর বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষকের নিকটে পড়াশুনা করিয়া প্রাইভেট ছাত্রীরূপে আই-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। যাহাহোক ১৯২৬ সালে প্রাইভেট্ ছাত্রী রূপেই তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন।

অতঃপর কঙ্কাবতী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে আর্টস্ বিভাগে আসিয়া ভর্ত্তি হ'ন এবং ইংরাজীতে এম্-এ পড়িতে থাকেন।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীমহল তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হ'ন।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলিকাতার কলেজসমূহে যেমন ছাত্রী গ্রহণ আরম্ভ হয় নাই—তেমনি বিশ্বাবিদ্যালয়েও ছাত্রীদের ভীড় সুরু হয় নাই। ১৯২২ সালে বি-এ পাশ করিয়া শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু, শ্রীমতী শান্তি দাস ও শ্রীমতী কঙ্কাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ মেলামিশার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। কঙ্কাবতীতো অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিজগৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কঙ্কাবতীর গৃহ ক্রমে কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রের সাপ্তাহিক সাহিত্য-বাসরে পরিণত হইল এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরই কোন প্রবীণ অধ্যাপকের পুত্র শ্রীযুক্ত...চন্দ্র সেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ একটা কথাও প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, শ্রী...চন্দ্র সেন ও কঙ্কাবতী সাহু পরস্পরের সহিত 'engaged'।

চির-নবীন লালগোপাল, উৎফুল্লচন্দ্র, অমৃতকুমার শ্রীকান্ত প্রভৃতি কৃতি শিক্ষকগণ কঙ্কাবতীর গৃহে বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে সাহিত্যের আসর ও মস্‌গুল করিয়া তুলিতেন।

কিন্তু এই সময়ে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় কঙ্কাবতীর জীবন-স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইল। কোন দুষ্ট ছাত্র ছাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষের দ্বারে কয়েকটী চিনির রাঙা লিচু টাঙ্গাইয়া রাখিয়া তাহার নীচে লিখিয়া দিল—"Beware of the forbidden fruit." কথাটা অধ্যাপক-দিগের শ্রুতিগোচর হইল এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ আর্ট বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্বর্গীয় অধ্যাপক ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। যে কারণে কঙ্কাবতীকে বেথুন কলেজ ছাড়িতে হইয়াছিল,

এই তদন্তের ফলে সেই কারণেই তাঁহাকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ ক্লাশে পড়িবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিদ্যা-চর্চ্চার মধ্য দিয়া উন্নত ধরণের জীবন যাপনের যে সাধু-সঙ্কল্প কঙ্কাবতী করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তাহার অবসান ঘটায় কঙ্কাবতীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এম-এ পাশ করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি অতঃপর সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদানের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি নিয়মিত অভিনয় করিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন। কলিকাতাবাসী সবিস্ময়ে সহরের দেয়ালগুলিতে প্রকাণ্ড প্রাচীর-পত্র দেখিতে পাইল—"ষ্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাহু বি-এ।"

ষ্টার থিয়েটারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরেই শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সহিত কঙ্কাবতীর পরিচয় হয়। কঙ্কাবতীর ন্যায় শিক্ষিতাকে অভিনয়-সঙ্গিনীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন। কেবল অভিনয়-মঞ্চে নহে জীবনের নাট-মঞ্চেও তাঁহাকে সঙ্গিনী করিয়া লইবার জন্য তিনি সাগ্রহে বাহুপ্রসারণ করিলেন। বলা বাহুল্য কঙ্কাবতী তাহাতে অমত করিলেন না। ষ্টার থিয়েটারের প্লাকার্ড বাহির হইয়া যাইবার পক্ষকাল মাত্র পরেই শিশিরবাবু পরিচালিত নাট্যমন্দিরের প্লাকার্ড সহরের রাস্তায় দেখা গেল—"নাট্যমন্দিরে শ্রীমতী কঙ্কাবতী বি এ।"

১৯৩০ সালে জনৈক মার্কিনবাসীর আমন্ত্রণে শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী সদলবলে মার্কিন যাত্রা করেন। শ্রীমতী কঙ্কাবতীও তাঁহার সহযাত্রী হ'ন। শিশিরবাবুও কঙ্কাবতী একই কেবিনে থাকিবেন মনস্থ করিলেন—কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী-পুরুষ এক কেবিনে বাস করিতে পারিবে না, জাহাজের এই প্রচলিত বিধি বাধা জন্মাইবে জানিয়া জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই শিশিরবাবু কঙ্কাবতীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের কথা এতই গোপন ছিল যে প্রথমে আমেরিকার কোন সংবাদপত্রে—পরে কলিকাতার কোন কোন পত্রিকায় শিশিরকুমার ও কঙ্কাবতীর যুগল ফটো মিষ্টার ও মিসেস্ ভাদুড়ী টাইটেল সহ প্রকাশিত না হইলে আমরা এই বিবাহের বিষয় জানিতেই পারিতাম না!

বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা ভাদুড়ী সুখেই ঘর-কন্না করিতেছেন। ইঁহাদের একটী সন্তান হইয়াছে, ঐ সন্তানটী এক দুঃস্থ ভদ্রপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে, কঙ্কাবতী ইহাদের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন আর সন্তান না হউক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রর্থনা।

শকুন্তলা চৌধুরী+রঞ্জিত রায়

অতি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁহার "নিরঞ্জন রায় ও উমা" নামক গল্পে দেশসেবার তপশ্চারণে তাপসী উমার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রটী তাঁহারই জন্ম ও লীলাভূমির এক দেশ-সেবিকার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে? উমার স্বদেশ-সাধনার তপশ্চর্য্যায় পাঠকের মন যখন শ্রদ্ধাভরে অবনত হইয়া পড়িত, তখন তাহার অনুরূপ দেশহিত-ব্রতধারিণী জীবন্ত তাপসীর দুই চারিটী চিত্র যে পাঠকের চিত্তপটে ভাসিয়া না উঠিয়াছে এরূপ নহে। কিন্তু উমার নীরব দেশ-সাধিকা মূর্ত্তির অন্তঃস্থলে যে সুদূর বিলাত প্রবাসী অধ্যয়নরত কোন যুবকের জন্য প্রতীক্ষমানা প্রেম-সাধিকা এক নারী মূর্ত্তিও বিরাজিতা ছিল, তাহাও যে কোন বাস্তব তাপসীর অন্তরেরই প্রতিবিম্ব, একথা কল্পনা করিতে কে পারিয়াছিল?

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মহিলা-কর্ম্মী ও নারী-আন্দোলনের নেত্রী, উচ্চ-শিক্ষিতা ও দেশ-সেবিকা, নারী-সমাজের মুখপত্র "জয়শ্রী"র সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শকুন্তলা চৌধুরীর নাম বঙ্গবিশ্রুত। অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বেও ঢাকায় নারী-মঙ্গল সপ্তাহ ও মহিলা-শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া ইনি গভীর স্বদেশানুরাগ ও একনিষ্ঠ জনহিতৈষণার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে শিক্ষিতা মহিলা সমাজে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তাঁহার ন্যায় উন্নত হৃদয়া মহিলা যে অসবর্ণ যুবকের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়া স্বদেশ-সেবা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের ন্যায় সামাজিক ক্ষেত্রেও আপনার বৈশিষ্ট্যানুরঞ্জিত পদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অতি সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত হিন্দু গৃহে শকুন্তলার জন্ম। তাঁহার পিতা শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী পাবনা জিলার অন্তর্গত ভারেঙ্গা নামক স্থানের

জমীদার। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনও পল্লীগ্রামস্থ আবাস স্থলে থাকিয়া জমীদারী পরিরক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন না। তাই জীবিকা ও আভিজাত্য গৌরব রক্ষায় অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি ঢাকায় ওকালতী করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া ঢাকা বারের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটী বিষয়ে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে—প্রথমতঃ অগ্রগামী সমাজের এক প্রতিপত্তিশালী পরিবার বলিয়া চৌধুরী পরিবার ঢাকায় খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ সন্তানদিগকে উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত করিবার সুযোগলাভ ঘটিয়াছে।

নরেন্দ্র বাবুর পিতা নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন; নরেন্দ্রবাবু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বশতঃ সে নিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহার গৃহে হিন্দুয়ানীর অভাব নাই। তিনি এক পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন পরিবারে বিবাহ করেন—অসবর্ণ বিবাহাদি হিন্দু-বিরোধী কার্য্যের জন্য যে পরিবার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার শ্যালক অবসর প্রাপ্ত জজ ও অধুনা আসাম গৌরীপুর এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্রগণ আন্তর্জাতিক বিবাহ করিয়া সমাজ-বিদ্রোহী দলে নাম লিখাইয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বদ বা প্রাইভেট্ সেক্রেটারী রূপে যিনি ভারতব্যাপী পরিচয় লাভ করিয়াছেন—মেম বিবাহ করিয়া সমাজ বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন। শকুন্তলার এক মামত ভাই এক সুশিক্ষিতা উৎকলবাসীনীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রেরণা শকুন্তলা যে তাঁহার মাতুল-গোষ্ঠি—বিশেষতঃ প্রগতি-যুগের তরুণ-তরুণীগণের ভূস্বর্গ, বিশ্বপ্রেমের পুণ্যপীঠ, শান্তিনিকেতনের অধিবাসী প্রাচ্য প্রতীচ্য মিলন-মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচর অমিয় চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতেই বোধ হয় পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে

পরিবার মধ্যে যথেষ্ট উদার ভাবের প্রশ্রয় দিলেও শকুন্তলার পিতা নরেন্দ্র চৌধুরী হিন্দুয়ানীটুকু বিসর্জ্জন দেন নাই। জ্যেষ্ঠ কন্যাকে তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন; ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত সুরেশ ঘটকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত মনীষ ঘটক তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র নির্ব্বাচনে পিতার যতটা হাত ছিল কনিষ্ঠা কন্যার বেলাও যে ততটা হাতই থাকিবে, এরূপ কোন কথা নাই। বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছিল যথাযথ বয়সেই এবং কনিষ্ঠা কন্যা শকুন্তলা চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন এবং দেশ-সেবা ও সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতাকেই আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতে শিখিয়াছেন। শকুন্তলা সম্পাদিত "জয়শ্রী" পত্রিকায় প্রচারিত ভাবধারার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, স্বাধীন-বিবাহের আবশ্যকতা এবং অভিভাবক নির্দ্দেশিত বিবাহের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রবন্ধে ও গল্পে অনেক যুক্তিই উহাতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। "জয়শ্রী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রথম সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা নাগ চির-কৌমার্য্য ব্রত বরণ করিয়া লইয়াছেন, দ্বিতীয়া সম্পাদিকা শ্রীমতী শকুন্তলাও অসবর্ণ পাত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। যুগপৎ রচনায় এবং সম্পাদিকাগণের জীবনের নিদর্শনে সমাজ-সংস্কার শিক্ষায় "জয়শ্রী" যে জয়যাত্রার পথে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি!

অবশ্য শকুন্তলা যাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় কৃতী ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে প্রলুব্ধ হওয়া কোন তরুণীর পক্ষেই অসম্ভব নহে। তাঁহার নির্ব্বাচিত স্বামী শ্রীযুত রঞ্জিত রায় একজন আই-সি-এস্ এবং এদেশের অভিজাত মহলও সিভিল সার্ভিস্‌কে বিবাহের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ যোগ্যতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় দেশসেবিকা যে স্বামীর সিভিল সার্ভিসে প্রলুব্ধা হইয়া এ-বিবাহে অগ্রসর হইয়াছেন এরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। নিশ্চয়ই অসবর্ণ বিবাহ

যাঁরা সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আপনার সম্পাদিত পত্রিকায় প্রচারিত ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার যে অত্যুদার প্রেরণা, তাহাই বোধ হয় তাঁহাকে এই বিবাহে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল।

তবে একথাও সত্য যে বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীযুত রায় শকুন্তলার নিকটে অপরিচিত ছিলেন না। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শকুন্তলার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং গত কয়েক বৎসরে এই পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইঁহারা দুইজনে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা লোকে শ্রীযুত রায়ের বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেই ধরিয়া লইয়াছিল। তবে শ্রীযুত রায়ের বিলাত-প্রবাস কালে শকুন্তলা দেশের কাজ লইয়া এতটা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, আই-সি-এস্ বিবাহে তিনি সম্মত হইবেন কিনা এ বিষয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের মনে সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক মে মাসের গোড়ার দিকে সদ্যঃ বিলাত প্রত্যাগত আই-সি-এস্ শ্রীযুত রঞ্জিত রায়ের সহিত কৃষ্ণনগরে শকুন্তলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঢাকার শিক্ষিত মহল এই বিবাহে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বহু দেশ-সেবিকা বঙ্গ-তরুণী বিবাহে যোগদান করিয়া তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও নেত্রীকে জীবন-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভের জন্য অশ্রুসজল নেত্রে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় দিয়াছিলেন।

ইঁহাদের জীবন সুখময় হোক্—সাহিত্য ক্ষেত্রের ন্যায় শকুন্তলার পারিবারিক জীবনেও জয়শ্রী কল্যাণপ্রদ হইয়া ফুটিয়া উঠুক এই আমাদের কামনা।



সুনীতি রায়+ডাঃ নরেন্দ্রনাথ রায়

মহৎ প্রবৃত্তি, সংস্কার প্রবণতা ও সৎসাহস সকলের মধ্যে সমান ভাবে দেখা দেয় না। বিশেষতঃ এই তিনটী গুণের সমবায় অতি অল্প লোকের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। অনেকের মধ্যে হয়তো আমরা মহৎ প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ পাই কিন্তু সৎসাহসের অভাব তাহাদিগকেও মহৎ প্রবৃত্তি পরিচালিত পথে চলিতে বাধা প্রদান করে। আবার কোথাও বা হয়তো মহৎ-প্রবৃত্তি ও সৎসাহস এই দুইটী গুণেরই সন্ধান মিলে, কেবল সংস্কার-প্রবণতার অভাব নূতনের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ উদারতার সহিত সৎসাহসের সংমিশ্রণ না ঘটিলে মহত্ব অনেক সময়েই কাজে আসে না।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশাল এই দুইটী জেলা কিন্তু এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর। এই দুই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে সৎসাহস ও উদারতার সংমিশ্রণ যতটা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, বাংলার আর কুত্রাপিও ততটা নহে। এই জন্যই শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বদেশ-হিতৈষনায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় উন্নত ঐ দুইটী জেলায় বে-পরোয়া সমাজ-সংস্কারের নিদর্শন আমরা হামেশাই দেখিয়া থাকি। বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সখ্য-বিবাহ প্রভৃতির নজীর ঐদুটী জিলা হইতেই যদি অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এই আখ্যায়িকার নায়ক ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ রায়ও বরিশাল জিলার অধিবাসী।

নরেন্দ্রনাথ বরিশাল সহরে প্রাইভেট্ প্রাক্‌টিশ করেন। তাঁহার পিতা বরিশালের একজন প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন মোক্তার। তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং এখনও আদালতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা উচ্চ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

মিঃকে গুহ বরিশালেরই জনৈক ভূম্যাধিকারী। তিনিও সপরিবারে বরিশাল সহরে বাস করেন। তাঁহার ভাগিনেয়ী সরযুবালা বিধবা; আখ্যায়িকার নায়িকা শ্রীমতী সুনীতি এই সরযুবালারই কন্যা। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সুনীতিদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কম নহে। ইঁহারা ডাক্তার রায়েরই স্বগ্রামবাসী। ইঁহাদেরও কিছু জমীদারী আছে। সুনীতির মাতা বিধবা বলিয়া অন্যান্য অংশীদারগণ সুনীতিদের ঠকাইয়া জমীদারীর অংশ গ্রহণ করেন—সুনীতির মায়ের এইরূপ বিশ্বাস।

সহরে প্রাক্‌টিশ করিলেও ডাঃ রায় বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে স্বগ্রামে যাওয়া আসা করিয়া থাকেন। স্বগ্রামবাসী হিসাবে সুনীতির মাতা সরযুবালার সহিত ডাঃ রায়ের পরিচয় ছিল। সরযুবালা যখন দেখিলেন—অপরিণত হইলেও ডাঃ রায় উদার চরিত্র এবং সৎ, তখন তিনি তাঁহাকে স্নেহ না করিয়া পারিলেন না। ভিন্ন জাতীয় হইলেও নরেন্দ্রনাথের সহিত এই পরিবারের আত্মীয়তা দিন দিন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে লাগিল এবং নরেন্দ্রনাথের উপরে বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া বিধবা সরযুবালা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পূজা অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিতে সমর্থা হইলেন।

উভয় পরিবারের মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, সুনীতি তখন কিশোর বয়স্কা। নাম-ডাকের সুন্দরী না হইলেও তাহাকে সুশ্রী বলা যায়। সরযুবালা নিজ পরিবার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গতিবিধি অবাধ করিয়া দিলেও কিশোরী-সুলভ লজ্জায় চঞ্চলা হাস্যমুখরা বালিকাটী অবিবাহিত তরুণ ডাক্তারের সহিত খোলাখুলি ভাবে মিশিতে পারিত না। ফলে উভয়ের মধ্যে একটী চাঞ্চল্যকর সঙ্কোচের ভাব থাকিয়া গেল; উভয়ের সাক্ষাতে যাহা উভয়েরই দেহ মনে এক অপূর্ব্ব ভাবলহর খেলিয়া যাইত।

কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎও যে উভয়ের মধ্যে কম ঘটিত তাহা নহে। ডাক্তারের ডাক্তারী ব্যবসা এই সময়ে প্রায় ধামা-চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

বরিশাল সহর ও রোগীকুল উভয়েরই নিকট তিনি তখন ডুমুরের ফুল হইয়া উঠিয়াছিলেন—লোকে নাকি ইহাও বলাবলি করিতেছিল যে ডাক্তার বুঝি ডাক্তারী ছাড়িয়া সুনীতিদের তহশীলদারের পদেই কায়েমী ভাবে বহাল হইলেন। যাহাহৌক—ডাক্তারের সকাশে পানটা জল-খাবারটা বহন করিয়া আনিতে সুনীতিকেই হইত। মৃদু আপত্তি উত্থাপিত হইতে দেখা দিলেও এসকল কার্য্যে সুনীতির তরফ হইতে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইত না, ইহা ডাক্তার লক্ষ্য করিতেন। তিনিও সহর হইতে এটা ওটা আনিয়া উপহার দিয়া আপনার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এই উপহার দানের ব্যাপারটা কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা অপ্রকাশ্যে সংঘটিত হইত।

নিঃসম্পর্কীয় অবিবাহিতা কিশোরীকে অবিবাহিত তরুণের অপ্রকাশ্যে উপহার দানের ফল যাহা হইতে পারে, এক্ষেত্রে তাহার অন্যরূপ দেখা গেল না। সরযুবালার মনে একেই কোন ঘোর-প্যাঁচ ছিল না, তাহার উপর তিনি জানিতেন সুনীতি নরেন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না। ইহা জানিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে নিজগৃহে রাত্রিযাপন পর্য্যন্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—নরেন্দ্রও সানন্দে আহারাদি করিয়া বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিতে গিয়াছেন। চরিত্রবান যুবকের যাহা সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে, সরযুবালার চ'ক্ষে নরেন্দ্র ছিলেন তাহাই।

নরেন্দ্রও অবশ্য এ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। বিবাহ যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন নরেন্দ্র ভিন্ন জাতীয় বলিয়া সুনীতিকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন না। অস্বীকার করিলেই বা তাঁহাকে কে ঠেকাইত? সরযুবালার ন্যায় সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিতা বংশমর্য্যাদা সম্পন্ন মহিলা যে কন্যার মর্য্যাদা যাচাই করিতে আদালতে গিয়া দাঁড়াইবেন না, ইহা তাঁহার খুবই জানা ছিল। কিন্তু বিধাতা নরেন্দ্রকে সে ধাতের করিয়া গড়েন নাই। আপনারই কৃতকর্ম্মের ফল নির্ব্বিরোধে গ্রহণ করিবার—প্রেমের খাতিরে সামাজিক লাঞ্ছনাকে বরণ করিবার যে সৎসাহস, তাহা তাঁহার ছিল।

তিনি বিবাহে সম্মতি দিলেন। স্থির হইল সুনীতির মাতা সুনীতিকে লইয়া বরিশাল যাইবেন এবং সেখানেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

কিন্তু হায়! এ সংসারে সৎকার্য্যে অনেক বিঘ্ন! সৎকার্য্য করিবার সৎসাহস না-হৌক, সৎকার্য্যে সহায়তা করিবার উদারতা যদি সকলের থাকিত, তাহা হইলে সৃষ্টি আজ অন্যরূপ ধারণ করিত। প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্র আর সুনীতি পরস্পরের সহিত সামাজিক মিলনে আবদ্ধ হইবেন, সঙ্কীর্ণ কূপ মণ্ডুক সমাজের চক্ষে কি তাহা কখনও সয়? যথেষ্ট সতর্কতা সত্বেও ব্যাপারটা লোক জানাজানি হইয়া গেল। যাহারা এই অছিলায় সুনীতির মাতার চরম লাঞ্ছনা করিবার জন্য সামাজিক শাসনাস্ত্র শানাইতেছিলেন, তাঁহারা এইবারে বিবাহে বাধা প্রদানে অগ্রসর হইলেন। সামাজিক শাসন বলিলেও ঠিক বলা হইবে না, অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধেও সমাজের শাণিতাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে পারে—যে প্রকারেই হৌক্ বিবাহটা বন্ধ করিয়া দিয়া সুনীতিকে তাহার তথা-কথিত 'দুষ্কর্ম্মের' দণ্ডবিধানের জন্য গ্রামের লোক প্রস্তুত হইল। অতি কষ্টে ইহাদের চ'ক্ষে ধূলি দিয়া নরেন্দ্রনাথ সুনীতিকে নৌকাযোগে বরিশাল নিয়া আসিলেন।

কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বাধার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথের পিতার বরিশাল সহরে কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সহরের উপরে তাঁহার প্রদত্ত বাধা প্রণয়ী-যুগলের পক্ষে হইয়া দাঁড়াইল প্রবলতম বাধা। এবাধাও উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া ভূতের বাড়ী বলিয়া পরিচিত একটী বাড়ীতে অতিশয় সংগোপনে একজন মাত্র পুরোহিত ডাকিয়া নরেন্দ্রনাথ সুনীতির পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই সুনীতি সুস্থ শরীরে ও নির্ব্বিঘ্নে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে জন্মের পাঁচ ছয়দিন পরে পুত্রটী জননীর কোল শূন্য করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। যে সদুদ্দেশ্য সাধনে—যে মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় বিধাতা দেবদূত সম পবিত্র

সেই শিশুরত্নটীকে আলাময় জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠান্তে কল্যাণময় বিধাতা আপনি তাহাকে নিজ অঙ্কে টানিয়া লইলেন। বিশ্ব-নিয়ন্তার কখন কোন অদৃশ্য হস্ত কি ছলে কার্য্য সাধন করে ক্ষুদ্র মানব তাহার কি বুঝিবে?

এই শিশুর বিয়োগে নরেন্দ্রনাথ ও সুনীতি উভয়েই অন্তরে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় উত্তর জীবনে তাঁহারা আরও অনেক পুত্র-কন্যার জনক-জননী হইবেন। তাঁহাদের কুটীর-প্রাঙ্গণ আরও অনেক সুপবিত্র শিশুর হর্ষ-চঞ্চল ক্রীড়া-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে, কিন্তু যাহার আগমন সম্ভাবনা মাত্র তাঁহাদের দুইটী জীবনকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে, তাঁহাদের প্রণয়-পরশ-স্নিগ্ধ কুটীরটী বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহার অবিদ্যমানতার কথা কি জীবনেও তাহারা ভুলিতে পারিবে?



বিভাবতী দেবী + কেলাপ্পন

"বহুদিন শুনিয়াছি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কথা। এই বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়া নিজের ভিতরকার অনেক কিছু গলদ ঢাকিবার চেষ্টা বাঙ্গালী করিয়াছে বহুবার, এখনও করিয়াছে বহু সময়। কিন্তু কর্ম্মে নিষ্ঠা ও পথচলার শুচিতা বাঙ্গালীক আজ তথাকথিত বৈশিষ্ট্যের মোহ হইতে মুক্ত হইবার সহায়তা অনেকটা করিতেছে তাহাও আমরা জানি।"

"বাংলার নারী ও পুরুষ এক সঙ্গে সংস্কার-হীন মুক্তি-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িবে—গতির গীতি উভয়ের শোণিত চঞ্চল করিয়া তুলিবে। এই সঙ্ঘবদ্ধ নারী ও পুরুষের অগ্রগতি স্থবির জাতির প্রাণেও যৌবনের রসধারা বহাইয়া দিবে। জাতির এই আনন্দ-ঘন ছবি বাস্তবরূপে রূপায়িত হইয়া বাংলার সারা অঞ্চলে একদিন দেখা দিবেই।"

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁহার "বাংলার নারী ও তাহার বৈশিষ্ট্য" এবং "স্বেচ্ছাসেবিকারূপে বাংলার নারী" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে উপরোক্ত যে কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, নারী-প্রগতির ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া আমরা পদে পদেই তাহার স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। জাতীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া বাংলার কতক নারী দিনে দিনে যেরূপ ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন, এক দিকে যেমন পুরাতন ও পচা বৈশিষ্ট্যের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল বিদূরিত হইতে আদৌ বিলম্ব নাই, অন্যদিকে তেমনি "আগল ভাঙ্গিয়া নীতি ও শুচিতার বাঁধন ছিঁড়িয়া" বাংলার কতক নারী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

বক্ষ্যমান আখ্যায়িকায় আমরা এই কথারই সত্যতা প্রতিপন্ন করিব। জানি—এই ঘটনাটী এতই বিচিত্র ও বিস্ময়কর যে ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে অনেকে সঙ্কুচিত হইবেন। কিন্তু অবস্থা ভেদে নারী যে কত নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া উপন্যাস বর্ণিত চরিত্রকেও হার মানাইতে পারে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও একথা স্বীকার না করিয়া যাই কোথায়!

সর্ব্ববিধ স্বদেশী ও নারী-আন্দোলনে বহরমপুর সহর যে কোন স্থান হইতে পশ্চাৎবর্ত্তী নহে একথা সকলেই জানেন। এই বহরমপুরে যখন নারী আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং তাহার সদস্যাগণ সহরের শোভাযাত্রা, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাঁদা আদায় এবং কেহ কেহ মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেক

অন্তঃপুরিকা মহিলারও মনে স্বাধীনতার বাসনা জাগরূক হইয়া উঠিল। এক ব্রাহ্মণকুল বধূ তো স্বাধীনতার ভাবে এতই প্রবুদ্ধা হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার স্বামী আর কিছুতেই তাঁহাকে গৃহাঙ্গনের অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। এই মহিলাটীর নাম শ্রীমতী বিভাবতী দেবী।

অনেক সাধু সন্ন্যাসী স্বামী যেমন তাঁহাদের গৈরিক পোষাক অথবা অঙ্গরাগে পাপ চিত্রটা ঢাকিয়া সাধুবেশে অপরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুলবধূর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, তেমনি খদ্দরে ভূষিত হইয়া স্বদেশিকতার নামেও কতক যুবক যুবতী পাপ পথে নামিয়াছিলেন, সেই প্রকার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিভাবতীর সম্বন্ধে ও অনেকের সেই ধারণা আছে যে তাঁহার স্বাদেশীকতা একটা অছিলা মাত্র।

বিভাবতীর স্বামী কাশিমবাজারের শ্রদ্ধেয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ষ্টেটে কার্য্য করিতেন। একে তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাহার উপরে আর্থিক অবস্থাও তাদৃশ সচ্ছল নহে। ঘরকন্নার কাজ ছাড়িয়া পথে পথে স্বদেশী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো যে সঙ্গতিবিহীন দরিদ্র গৃহিণীর পক্ষে চলে না, একথা তিনি স্ত্রীকে বারংবার বুঝাইয়া দিলেন। আপনার পত্নীকে সমা কভাবে জানিতেন বলিয়াই হৌক কি দেশ-সেবার মহিমা উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিলেন বলিয়াই হৌক—তাঁহার মনে একটু দুর্ব্বলতাও ছিল, দেশের কাজ করিতে গেলে অপরিচিত পুরুষের সহিত যে সংশ্রব নারীর পক্ষে অপরিহার্য্য তাহাতেও দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণের মন সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারিতেছিল না। স্ত্রীর আবদার প্রতিপালন করা দূরে থাক্ তিনি নারী আন্দোলনকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া স্ত্রীর নিকটে আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রুপ ও কুৎসা করিতে লাগিলেন।

অল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণ এইখানেই মস্ত বড় ভুল করিয়া বসিলেন; স্ত্রীকে যদি তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যও বাহিরে যাইবার—শোভাযাত্রা ও সভা-সমিতিতে যোগদান করিবার অনুমতি প্রদান করিতেন

তাহা হইলে তাঁহার পরিবার সম্পূর্ণ না-হোক অন্ততঃ কতটা পরিমাণে রক্ষা পাইত। অন্ততঃ তিনি যদি কোন আপনার লোককে সঙ্গে দিয়া স্ত্রী যাহাতে প্রতিদিন বৈকালে একটু রাস্তায় বেড়াইয়া আসিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার কয়েকজন বন্ধুর সহিত স্ত্রীর আলাপ করাইয়া দিতেন, তাহা হইলেও স্ত্রীর সংসার ত্যাগের প্রয়োজন ঘটিত না। ইহা না করিয়া নিতান্ত স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি চাহিলেন একমাত্র আপনারই সংসর্গে আপনারই গৃহ সীমানার মধ্যে স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখিতে। স্বাধীনতার বাতাস যাহার গায়ে লাগিয়াছে, সে এরূপ অবরোধ বন্ধনে থাকিবে কেন? দেশের আহ্বান যাহার কাণে পৌঁছিয়াছে, গৃহধর্ম্মের মায়াপাশে সে আবদ্ধ রহিবে কেন?

এক শুভদিনে স্বামীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিভাবতী স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীর অছিলায় মুক্তির অনন্ত আস্বাদ অনুভব করিতে স্বদেশ-আন্দোলনের বৃহত্তর ক্ষেত্র—মুক্তির লীলাভূমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

বিভাবতীর বয়স ঐ সময় প্রায় বত্রিশ। বত্রিশ বৎসর বয়স হইলেও যৌবনশ্রী তখনও নষ্ট হয় নাই, কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁহার কন্যা অপর্ণার বয়স এই সময়ে চৌদ্দ কি পনেরো। কান্দি মহকুমায় শ্রীযুক্ত শ্রীহরি ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিভাবতীর ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক এক পুত্রও ছিল। উত্তরকালে কলিকাতায় আসিয়া এই পুত্র মাতার সহিত বাস করিতে থাকে; এখনও মাতার সঙ্গেই আছে।

যতই স্বাধীনতার আলোক প্রাপ্ত হোক না কেন, নারীকে পিতা, স্বামী কিংবা অপর কোন আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে থাকিয়াই স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অদ্যাবধি বাংলায় যত মহিলা-কর্ম্মী দেখা দিয়াছেন, উমা দেবী ব্যতীত সকলেই একমাত্র কারাবাসকাল ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন আত্মীয়ের অভিভাবকত্বেই বাস করিয়াছেন। নারী-

আন্দোলনের নেত্রীবৃন্দও অভিভাবকের আয়ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসা কোন নারীকে আশ্রয়দানে সাহসী হয় নাই। অবশ্য ইহা তাঁহারা কেবল নীতির দিক হইতেই করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; নিঃসম্পর্কীয়া মহিলাকে আশ্রয়দানের পক্ষে আইনগত বাধাও কম নহে। বিভাবতীর ন্যায় আর একটী রমণী স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়া এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল যে নেত্রীবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই রমণী শেষে কোন নারী-আশ্রমে আশ্রয় লইতে বাধ্য হ'ন। ইঁহার প্রদত্ত একটী বিবৃতিও পত্রাকারে কোন বাংলা সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছিল। যাহা হৌক এই রমণী তৎকালে স্বামী কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইলেও এতদিনে স্বামীর আশ্রয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

বিভাবতীও গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন বটে, কিন্তু নারী-আন্দোলনের নেত্রীগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইলেন না। অগত্যা তিনি দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়া উঠিলেন এবং সেখানে থাকিয়া আন্দোলনে যোগদানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার সেই আত্মীয়ও নারী-আন্দোলনের পক্ষপাতী নহেন; সে পরিবারস্থ কোন মহিলা আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। পরিবারস্থ পুরুষগণ দেশের কাজে যোগদানে তাঁহার সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক্—পরোক্ষে তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ফলে এই বাড়ীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। নূতন আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

বিভাবতী যদি নির্দ্দিষ্ট কাহাকেও আশ্রয় করিয়া কলিকাতায় আসিতেন, তাহা হইলে কথা ছিল না। অবশ্য অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে পরিচয় লাভের পরিধি তাঁহার তখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

তাই দেশ-সেবার চিন্তা অপেক্ষাও আশ্রয়লাভের চিন্তা তাঁহার পক্ষে বড় হইয়া দাঁড়াইল। তবে অসাধারণ বুদ্ধি ও নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা প্রবণতার বলে তিনি আশ্রয় জুটাইয়া লইলেন। কিন্তু হাজার হোক্ স্ত্রীলোক তো, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে মানুষ চিনিয়া লইতে একটু বিলম্ব ঘটিবারই কথা। কোন আশ্রয়ই তাঁহার স্থায়ী হইল না। নিরুপায় হইয়া তিনি একবার স্বামীর কাছেও ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন—গ্রহণ করিতে স্বামীই সম্মত হ'ন নাই।

এই সময়ে কিছুদিন তিনি খদ্দরের জামা-পোষাক বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করেন। কয়েক মাস এইভাবে কাটাইবার পরে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার ফলে বিভাবতী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ শয্যায় এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত মুখে তুলিয়া দিবার লোক তাঁহার ছিল না। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব বিধানে এক মাদ্রাজী যুবকের সহিত রোগশয্যায় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার দুঃখ-কষ্টে দয়ার্দ্র হৃদয় মাদ্রাজী যুবকটী এই দুঃসময়ে তাঁহার চিকিৎসা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করিলেন।

যুবকের পরিচর্যায় বিভাবতী নিরাময় হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু যুবক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। ঐ যুবকেরই আশ্রয়ে রহিয়া বিভাবতী অল্পদিনের মধ্যে নষ্টশ্রী ফিরিয়া পাইলেন।

কোথায় মাদ্রাজী যুবক কেলাপ্পন আর কোথায় বঙ্গরমণী বিভাবতী। বিধাতার কি বিচিত্র বিধানে উভয়ের মধ্যে শুভ-সংযোগ ঘটিল। কেলাপ্পান মাদ্রাজী, বাংলা ভাষায় কথা বলিতে পারা দূরে থাক্—বাংলা কথা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে না, আর বাঙ্গালী মহিলা বিভাবতী তো কেলাপ্পানের মাদ্রাজী বুলির একাক্ষরও বুঝিতে অক্ষম! তাহার উপরে কেলাপ্পন খৃষ্টান, বিভাবতী হিন্দু কন্যা, ব্রাহ্মণ-কুলবধূ। ইহাদের দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক ও আন্তধর্ম্মী মহামিলনের এক মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই বুঝি বিধাতা অলক্ষ্য হইতে ভাগ্যবতী বিভাবতীর

কাণে দুকূল-ভাঙা সর্ব্বনাশা বাঁশীর ধ্বনি শুনাইয়াছিলেন। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বুঝি বিধাতৃ-নির্দ্দেশে এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণে বিভাবতীকে ক্ষুদ্র সংসারের গৃহাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর সংসারের বিস্তৃতাঙ্গনে পদার্পণ করিতে সঙ্কেত করিয়াছিল।

ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে—কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়াই সেদিন এই দুইটি নরনারী পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। জাতীয়তা ও ধর্ম্মের বাধা অপেক্ষাও তাহাদের পবিত্র মিলনে বড় বাধা ছিল বয়সের পার্থক্য। বিভাবতী তখন আন্দাজ তেত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন আর কেলাপ্পনের বয়স পঁচিশের উর্দ্ধে নহে। তেত্রিশ বৎসর বয়স হিন্দুনারীর প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রমণের বয়সের প্রায় কাছাকাছি। মনের রঙে দেহকেও রঙীন্ করিয়া যদি বিভাবতী পলায়মান যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে না পারিতেন, তাহা হইলে কি আর পঁচিশ বৎসরের প্রথম-যৌবন-স্বপ্নে বিভোর কেলাপ্পন তাঁহার নিবেদিত প্রেমার্ঘ্য গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইতেন? কিন্তু বিধাতা দুর্ণিবার দাহিকা-শক্তি দিয়া যাহাদিগকে সংসারে পাঠান শৈত্যাদি তাহাদের নিকট হইতে আপনি পলায়ন করে—বয়সই শুধু তাহাদের নিঃশেষ হইতে থাকে, মনের যৌবনে দেহের যৌবনকেও তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া রাখিতে পারে। আমরা অল্পদিন পূর্ব্বেও বিভাবতীকে দেখিয়াছি। ঈশ্বর না করুন যদি এমন দুর্দ্দিন আসে যে দ্বিতীয় স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে কিংবা দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গ পরিহার করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৃতীয় আশ্রয় সংগ্রহও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে না। চল্লিশ পার হইয়াও তাঁহার দেহে সে বহিঃসৌন্দর্য্য আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

বিবাহের পূর্ব্বে নূতন সমস্যা জাগরুক হইল—কোন্ মতে বিবাহ হইবে। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যেমন নারী তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী স্বামী জীবিত থাকিতেও পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, খৃষ্টান ধর্ম্ম মতে

সেরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু নির্ব্বিরোধী দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্বামী যে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটা হাঙ্গামা বাধাইতে অগ্রসর হইবে না, বিভাবতী সেকথা ভালই জানিতেন। তাই খৃষ্টান ধর্ম্মমতেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

স্বামী, ঘর-সংসার প্রভৃতি ব্যাপারকে বিভাবতী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—স্বাধীনতাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু, মুক্তিই তাঁহার চরম লক্ষ্য। দ্বিতীয় পতি-পরিগ্রহ দ্বারা এই স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উড্ডীন করিতে পারিয়াছেন—মুক্তির পুণ্যবেদী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থা হইয়াছেন, এই চিন্তাকেই তিনি দ্বিতীয় বিবাহের স্বার্থকতা বিবেচনা করিলেন, নহিলে নূতন করিয়া একজন পুরুষের সমীপে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ বা নূতন করিয়া গৃহস্থালীর পাটে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় তেজোময়ী রমণীর পক্ষে সম্ভবও নহে, শোভনও নহে। প্রণয়মুগ্ধ কেলাপ্পন হয়তো প্রথমে একথা বুঝেন নাই এবং শেষে বুঝিয়াও প্রতীকারোপায় খুঁজিয়া পান নাই। একান্ত অনুগত স্বামীর ন্যায় নীরবে তাঁহার আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইয়া আসিয়াছেন, এখনও তাহাই করিয়া থাকেন।

এখন একটু খুঁটিনাটি লইয়া মত বিরোধ হইলেই বলিয়া থাকেন—"কি ছিলাম, কোথায় এলাম। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী আমাকে 'সধবা পূজা' করিয়া সাড়ী সিঁদুর দিয়াছেন আর আজ আমি কোথায়!" অদৃষ্ট অদৃষ্ট বলিয়া তিনি নিজকে অনেক সময় ধীক্কার দিয়া থাকেন। বিভাবতী এখন তাঁহার ভুল বুঝিয়াছেন বটে, কিন্তু ফিরিবার তো উপায় নাই!

অপর্ণা দেবী + নগেন্দ্র চ্যাটার্জ্জী

মানুষ মাত্রেরই স্বভাব এই যে, সে নিজে যদি কোন ভাল জিনিষের রসাস্বাদন করে, তাহা হইলে অপরকেও তাহার আস্বাদ গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। বিভাবতীও নিজে যে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বীয় কন্যা অপর্ণাকে সেই স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কন্যা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া নতমস্তকে স্বামীর ঘর সংসার করিবে, বিভাবতীর ন্যায় স্বাধীনতা-প্রিয় মাতা এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার অবশ্যই বরদাস্ত করিতে পারেন না। নূতন স্বামীর সহিত মিলিত হইবার পরেই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল কি করিয়া অপর্ণাকে তাহার স্বামী-গৃহের আবেষ্টনের মধ্য হইতে বাহির করিয়া অবাধ স্বাধীনতার লীলাভূমি কলিকাতায় আনয়ন করেন।

কিন্তু কি করিয়াই বা তাহা সম্ভাবিত হয়? দেশে ফিরিয়া স্বজন-গণের সাক্ষাতে দেখা দিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল; কিন্তু পূর্ব্বস্বামী কিংবা কন্যার শ্বশুর ও গৃহস্থ লোকেরা অপর্ণাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না, ইহাই সম্ভবপর। তাই তিনি চিঠিপত্রের মারফৎ কন্যার নিকটে আপনার গৌরবজনক স্বাধীনতা-সুখের বিস্তৃত বিবরণী ও স্বাতন্ত্রের পথে চলিয়া নারীত্বকে জাগরিত করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

অপর্ণাও মায়েরই কন্যা। মাতার অন্তরে যে স্বাধীনতা-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল, তাহার দোলায় তাহার বক্ষও দুলিয়া উঠিল। বিভাবতী স্বীয় যৌবনের বৃহত্তর অংশ স্বামীগৃহে অপব্যয় করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু অপর্ণার সর্ব্বাঙ্গ তখন সবেমাত্র নূতন যৌবন-রসে টলমল করিয়া উঠিয়াছে। মাতার সুখ-হিল্লোল বার্ত্তা শ্রবণে সে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল; হিতৈষিণী মায়ের উপদেশরাশি সে অমৃতবৎ উপাদেয় বিবেচনা করিল। কি করিয়া সে গৃহের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বৃহত্তর লীলাক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে পারে, কি করিয়া সে সীমা ছাড়িয়া অসীমের পানে ধাবিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মায়ের মহোপদেশ চাহিয়া পাঠাইল। বিভাবতী কৌশল করিয়া জামাতা শ্রীহরি ভট্টাচার্য্যের নিকটে চিঠি লিখিলেন, যেন তিনি অপর্ণাকে লইয়া একটীবার কলিকাতায় আসেন—কন্যা-জামাতাকে দেখিবার জন্য

তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ে স্নেহসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে.........ইত্যাদি। কিন্তু এ কৌশলও ব্যর্থ হইল—মায়ের এই স্নেহসিক্ত সকাতর আহ্বানে হৃদয়হীন জামাতার পাষাণ অন্তর বিগলিত হইল না।

অগত্যা অপর্ণা নিজেই নিজের পথ করিয়া লইবার জন্য সুযোগের সন্ধান খুঁজিতে লাগিল। সাহসে বুক বাঁধিয়া এক দিন সে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিল। তাহার শ্বশুরালয় হইতে মহকুমা-সহর কান্দি বার মাইল পথ। অপর্ণার তরুণ হৃদয়ে স্বাধীনতার বহ্নি এমনি তীব্র শিখায় প্রজ্বলিত যে দূরত্বের ব্যবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বার মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবার সঙ্কল্প করিয়া সে নৈশ অন্ধকারে একা পথ চলিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! এ জ্বালাময় জগতে মহৎকার্য্যে পদে পদে বাধা—পুণ্যের পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ। সুন্দরী তরুণীকে রাত্রির অন্ধকারে একা পথ চলিতে দেখিয়া দুইজন কঠোর হৃদয় কনেষ্টবল থানায় লইয়া গেল। বে-দরদী সাবইন্‌স্‌পেক্টর তরুণীকে আটক রাখিয়া তাহার স্বামীকে খবর পাঠাইলেন। স্ত্রীর স্বাধীনতা-বিদগ্ধ হৃদয়ের বিষয় স্বামী কিছু কিছু বুঝিতেন, তিনি তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইতে অস্বীকার করিয় তাহার মুক্তিপথে সহায়তা করিলেন। মুক্ত বিহঙ্গিনী এইবার পাখা মেলিয়া অসীম সংসার-ব্যোমে উড্ডীন হইল। কলিকাতায় আসিয়া জননীর সহিত মিলিত হওয়া তাহার পক্ষে আর কঠিন হইল না।

গৃহত্যাগ কালে অপর্ণার কোন পুরুষ বন্ধু ছিল কিনা এবং সেই পুরুষ বন্ধু গৃহত্যাগে তাহাকে সহায়তা করিয়াছিল কিনা, এরূপ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে। অপর্ণা নিজে এরূপ কোন পুরুষ বন্ধুর বিদ্যমানতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। থানার 'অনুসন্ধানে'ও এরূপ কোন প্রামাণ পাওয়া যায় নাই।

বহু আয়াসে কন্যা মাতার সহিত মিলিত হইল, মাতাও তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। কন্যার মুখে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া মাতা তাহার বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন। বিজয়িনী কন্যার এরূপ বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে কোন্ স্বাধীনতাপন্থী জননীর হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে?

অপর্ণা সাধারণ বাংলা লেখা-পড়া জানিতেন। বিভাবতী তাহাকে অধিকতর শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে সঙ্কল্পিত হইলেন। কন্যার হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করাই বিভাবতীর প্রধান উদ্দেশ্য। অপর্ণাকে তিনি

কনভেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। নানা কারণে এই স্কুলে বেশীদিন পড়া হইল না, তৎপর শিল্প শিক্ষার জন্য তাহাকে "সরোজ-নলিনী নারী-শিক্ষালয়ে" ভর্ত্তি করিলেন; সেখানেও সে বেশী দিন রহিল না।

বিভাবতীর ইচ্ছা ছিল অপর্ণা তাঁহার ন্যায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, কিন্তু অপর্ণা তাহাতে তীব্র অস্বীকার জানাইল। অগত্যা বিভাবতীকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

বিভাবতী জানিতেন—স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে এবং স্বাধীনতা-সুখ একটু সম্মান ও সামাজিক মর্য্যাদার সহিত সম্ভোগ করিতে হইলে সঙ্গে একটী স্বামী রাখা স্ত্রীলোকের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই কারণেই তিনি নিজে প্রবীণা হইয়াও এক তরুণ যুবককে তাঁহার স্বামীত্বের গৌরব প্রকাশে সুযোগ দিয়াছিলেন এবং এই কারণেই কন্যার জন্যও একটী অনুগত ও মনোমত পাত্র জুটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এতদুদ্দেশ্যে বিভাবতী অনেক খৃষ্টান যুবককে বাসায় লইয়া আসিতে লাগিলেন। দেশীয় খৃষ্টানের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিজন ফিরিঙ্গীকেও না আনিলেন তাহা নয়। অপর্ণা তাহাদের সকলের সহিত আলাপ করিল, সকলের সহিত মিশিল, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও যে বিবাহ করিবে, এরূপ ভাব দেখা গেল না। বস্তুতঃ বিবাহ ব্যাপারে অপর্ণার তাদৃশ উৎসাহ ছিল না, কিন্তু মনের কথা গোপন করিয়া সে মাতার নিকটে ইহাই প্রকাশ করিল যে, সে কোন খৃষ্টান বা মুসলমানকে বিবাহ করিবে না।

খৃষ্টান বা মুসলমানকে বিবাহ করিবে না বলিল, কিন্তু অবশেষে এক ভিন্ন জাতীয় যুবককেই অপর্ণা মনোনয়নের অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার অগ্রজ তীব্র বিরোধ উপস্থিত করায় এই বিবাহ সঙ্ঘটিত হইতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পরে অপর্ণার অগ্রজ কলিকাতায় আসিয়া মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মাতা যে পাত্র নির্ব্বাচিত করেন, অপর্ণার তাহাকে পছন্দ হয় না এবং অপর্ণা যাহাকে অনুগৃহীত করে, মাতা তাহাকে বিতাড়িত করেন। এইরূপ গণ্ডগোলে অপর্ণার পুনর্ব্বিবাহে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। অবশ্য পাণিপ্রার্থী-গণের আগমনে বিরতি ঘটিল না; নিত্য নূতন বিবাহার্থীর সহিত আলাপে অপর্ণা তিক্তবিরক্ত হইতে লাগিল; তবে থিয়েটার বায়স্কোপে কিংবা

গড়ের মাঠে ভ্রমণে অপর্ণার দিনগুলি একরূপ মন্দ কাটিতে লাগিল না। কিন্তু একটী কারণে বিবাহ অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

বয়সের সমতা ও সঙ্গতির জন্যই হৌক, কি অপত্য স্নেহবশতঃই হৌক অপর্ণার নূতন পিতা তাহাকে একটু স্নেহের চ'ক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিভাবতীর ইহা ভাল লাগিত না। ইহা লইয়া কন্যা ও মাতা, স্বামী ও স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া লাগিয়া থাকিত। ফলে অপর্ণার মাতা অতিসত্বর কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এখন মা ও মেয়েতে প্রায়শঃ ঝগড়া হইয়া থাকে এবং ঐ ঝগড়ার ফলে মেয়ে মায়ের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দু'চার দিন বাহিরে বন্ধুবান্ধবগণের বাড়ীতে থাকে। ঝগড়া হইলেই মেয়ে মাকে বলে—"আমার এ অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী। আমি স্বামী গৃহে সুখেই ছিলাম। তোমার প্ররোচনাতেই তো সে আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

১৯৩১ সালের মাঝামাঝি সময়ে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় নামক এক যুবকের সহিত অপর্ণার পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের অল্প পরেই উভয়ের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হয়। যে প্রেম-দেবতার পঞ্চশর বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করে, নগেন্দ্র ও অপর্ণা উভয়েই সেই দেবতার নিক্ষিপ্ত ফুলশরে আহত হইলেন। অপর্ণা পূর্ব্বস্বামীর কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথও মদন ঠাকুরের মোহে তাহার স্বামীর বিদ্যমানতার কথা জানিয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে কন্যার বিবাহের জন্য বিভাবতী যদিও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তথাপি যে এই বিবাহ প্রেমজ বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। প্রেমজ বিবাহের ফলে কন্যা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া বসিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি এই বিবাহে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু অপর্ণাও তো তাঁহারই কন্যা, মায়ের প্রদত্ত বাধা তাহার নিকটে বাধা বলিয়াই মনে হইল না; বিভাবতীর অসাক্ষাতে সে নগেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নগেন্দ্র বিভাবতীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহাকে ও অপর্ণাকে লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইয়া আসিতে চাহেন। বিভাবতী স্বীকার করিলেন। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তিন জনে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নগেন্দ্রের শিক্ষামত গাড়োয়ান গাড়ীখানি নগেন্দ্রের বাড়ীর দরজায় লইয়া গিয়া থামাইল। নগেন্দ্র তাড়াতাড়ি অপর্ণাকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

বিভাবতীকে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ দিয়া কোচ্-ম্যানকে বিদায় করিয়া অপর্ণাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া নগেন্দ্র সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজায় কয়েকবার করাঘাত করিয়া অবশেষে মুখ চূর্ণ করিয়া বিভাবতী ঘরে ফিরিলেন। তিনি নাকি মোকদ্দমার চেষ্টাও করিয়াছিলেন ; কিন্তু কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া অবশেষে নিরস্ত হইলেন।

নবেম্বর মাসে নগেন্দ্রের সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহ-কার্য্য কোন্ ধর্ম্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে, অপর্ণা সে কথা সঠিক বলিতে পারে না। সে বলে যে, কি একটা এফিডেফিট্ তাহারা পড়িয়াছে এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নগেন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দেন।

অপর্ণার প্রথম স্বামী শ্রীযুত শ্রীহরি ভট্টাচার্য্য অদ্যাপি জীবিত আছেন। পত্নীর দ্বিতীয় পতি-গ্রহণের খবর তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে কিনা জানি না, তবে বিবাহের পরে তিনি কোন হাঙ্গামা উপস্থিত করেন নাই এইটুকু আমরা জানি।

অপর্ণার স্বামী ষ্টেট্স্‌ম্যান্ আফিসে টাইপ্ রাইটারের কাজ করিতেন বলিয়া প্রকাশ।

অপর্ণার পতিত্ব গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপর্ণার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের দুশ্চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। বিবাহের পরে অপর্ণা কয়েক দিনের জন্য একবার মুর্শিদাবাদ ও কাশিম-বাজার বিজয় করিয়া আসিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার মোহিনী শক্তিতে দ্বিতীয় স্বামী এতই মুগ্ধ ছিলেন যে পত্নীর কোন ইচ্ছাতেই তিনি কখনও বাধা প্রদান করেন নাই।

গত মে মাসে (১৯৩৩) নগেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। পতি-বিরহিনী যুবতী বিরহতপ্ত হৃদয়ে শান্তিদানের জন্য তৃতীয় স্বামী সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন।

শ্রীমতী বিভাবতী ও অপর্ণার নিকটে আমরা ঘটনা যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। কোন অংশ বিকৃতরূপে বর্ণিত হইয়া থাকিলে তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী, আমরা নহি।

কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক কাশিমবাজারে খবর লইলে ইহাদের বিষয় সম্যক অবগত হইতে পারিবেন।

অমিয়া রায়+ভানু ব্যানার্জ্জী

বাংলা দেশে ফিল্মশিল্পে যে কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, শ্রীযুত চারু রায় তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীযুত রায় বাংলার একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী, ভারতীয় চিত্র-শিল্পে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত। প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুত হিমাংশু রায়ের সঙ্গে তিনি সর্ব্বপ্রথমে চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন। এই হিমাংশু রায়ের সহযোগিতায় তিনি প্রথমে "The love of a Moghal Prince" নামক চিত্রের পরিচালনা করেন। উক্ত চিত্রের পরিচালনা এত সুন্দর হইয়াছিল যে উহাদ্বারাই শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক বলিয়া দেশবাসীর নিকটে খ্যাতি লাভ করেন। বস্তুতঃ ফাইন্-আর্ট বা কারু-কলা-যুক্ত ছায়াছবির পরিচালক বাংলা দেশে তাঁহার তুল্য আর একজনও নাই বলিলেও চলে।

শ্রীমতী অমিয়া রায় এই চারু রায়েরই ভগ্নী। অগ্রজ শ্রীযুত চারু রায় ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা মায়া রায়ের অভিভাবকত্বে অমিয়া বাস করিত। এইখানে একথা বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না যে শ্রীযুক্তা মায়া রায়ও একজন শিক্ষিতা ও উদারচেতা মহিলা। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চিত্র ও নাট্যজগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হ'ন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-গৃহস্থ হইলেও সামাজিক প্রতিষ্ঠার দরুণ ও রায় পরিবার অবরোধ রক্ষা করিয়া চলেন না, চারু রায়ের সঙ্গে মায়া রায়েরও সম্বর্দ্ধনা পার্টি ও প্রীতি-ভোজ প্রভৃতিতে যোগদান করিতে হয়। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর বিশেষ স্নেহাস্পদা বলিয়া অমিয়াও কখন কখন ঐ সকল পার্টিতে যোগ দিয়া থাকেন।

বিবাহের পূর্ব্বে অমিয়ার বয়স ১৯৷২০ বৎসর হইয়াছিল। সে থার্ড ক্লাশে পড়িত। ভ্রাতৃবধূর ন্যায় সেও অবরোধ মানিয়া চলিত না, দাদা ও বৌদির বন্ধুগণের সম্মুখে বাহির হইত। চারু বাবু একজন দেশ-বিখ্যাত শিল্পী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছায়াচিত্র-পরিচালক, তাহার উপরে তিনি ও তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা মায়া রায় একসঙ্গে "The love of a Moghal Prince" নামক চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। বাংলার খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-শিল্পী ও নাট্য-রসিকেরা প্রায় সকলেই চারু-বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। অমিয়াও ইহাদের অনেকের সহিত পরিচিতা।

চিত্র-জগতের খবর যাহারা রাখেন, বাংলার অন্যতম কুশলী তরুণ চিত্রনট শ্রীযুত ভানু ব্যানার্জ্জীকে তাঁহারা অবশ্যই চিনিতে পারিবেন। ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের ছায়াছবি "নিষিদ্ধ ফল" এ সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়া শ্রীযুত ব্যানার্জ্জী চিত্র-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে ইনি আরও কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করেন এবং শ্রীযুত চারু রায়ের পরিচালিত শ্রীযুত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে গৃহীত "স্বামী" নামক চিত্রেও ইনি একটী বিশিষ্ট অংশ অভিনয় করেন।

এই চিত্রের অভিনয় সম্পর্কে ভানু ব্যানার্জ্জীকে প্রায়শঃ চারু-বাবুর বাড়ীতে যাইতে ও তাঁহার নিকটে উপদেশ লইতে হইত। এই সূত্রে ভানু ব্যানার্জ্জীর সহিত অমিয়ার পরিচয় হইল। ভানুর বয়স ২৬৷২৭ বৎসর হইলেও দেখিতে তাঁহাকে আরও তরুণ দেখায়। তাহা ছাড়া শারীরিক সৌন্দর্য্য-শ্রীতে তাঁহার প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অমিয়ার দৈহিক সৌন্দর্য্য তেমন না থাকিলেও বয়সোচিত লাবণ্য ও মাধুর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া রহিয়া তাঁহাকে চিত্তাকর্ষক রূপ দিয়াছিল।

ওদিকে চারুবাবু নিজে ভানুকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। চারুবাবুর পত্নীও এই সচ্চরিত্র সুদর্শন যুবকটীকে গোড়া হইতেই আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিয়াছিলেন। তাই ইঁহারা যখন টের পাইলেন, ভানু ও অমিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন অসন্তুষ্ট হইলেন না। অসন্তুষ্ট না হইবার হয়তো আরও কারণ ছিল ; বৈদ্যের ঘরের মেয়ের কোনও রকমে একটী সৎপাত্র জুটাইয়া বিবাহ দিতে হইলেও তিন চারিটী হাজার টাকার কমে হয় না। সে ক্ষেত্রে একেবারে বিনা পয়সায় এমন একটী সৎপাত্র জুটিয়া গিয়াছে, ইহা কি কম আনন্দের কথা! চারুবাবুর স্কন্ধ হইতে যেন মস্ত একটী বোঝা নামিয়া গেল, তিনি উৎসাহের সহিত উহাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিবাহে কিঞ্চিৎ বাধা ছিল—ভানু ব্রাহ্ম আর চারুবাবু হিন্দু-গৃহস্থ। বরপক্ষ হইতে প্রস্তাব উঠিল—বিবাহের পূর্ব্বে কনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া লইতে হইবে।

চারুবাবু ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। যথা নিয়মে অমিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল। দীক্ষার পরেই উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। হিন্দু-কুমারী অমিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া স্বামীর

সংসার করিতে চলিল। বিবাহের জন্য হিন্দু যুবকের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিদর্শন অনেক দেখা গিয়াছে, কিন্তু বিবাহের খাতিরে হিন্দু-কুমারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইতে আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

ভানু ব্যানার্জ্জী ছায়াচিত্র জগতের লোক। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সুনীতি-সঙ্ঘের মাথায় পদাঘাত করিয়া বায়স্কোপ, ভদ্রনারী নৃত্য প্রভৃতিতে ব্রাহ্ম তরুণ-তরুণীরা যতটা মাতিয়া গিয়াছে, হিন্দু তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

রাণী নিরুপমা + শিশির সেন

আমরা প্রায়শঃ দেখিতে পাই, যাহাদের মধ্যে কবিত্ব প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের জীবনও বেশ একটু বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্য অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সমান চাঞ্চল্য ঘটায় না; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বিপ্লবের বন্যা লইয়াই দেখা দেয়। ইহার কারণ বোধ করি এই যে কবি-চিত্ত প্রবহমানা স্রোতস্বিনীর ন্যায়—কখনও ইহা কুলু কুলু স্বরে শান্তভাবে কখনও বা উত্তাল-তরঙ্গ বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ ভীষণাকারে প্রবাহিত হয়।

ভূতপূর্ব্ব কুচবিহার-রাজকুলবধূ, বর্ত্তমানে সেন বংশের শুদ্ধান্তঃ-পুরবাসিনী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর মধ্যে যে সুকুমার কবি-চিত্তটীর সন্ধান আমরা পাই, তাহা কোন্ শ্রেণীর বোঝা কঠিন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে যুক্ত-প্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে নিরুপমার জন্ম হয়। নিরুপমার পিতা স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে হোসেঙ্গাবাদে বাস করিতেন, তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গও তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। ইহাদের নিবাস কলিকাতা। নিরুপমার পিতা মতিলাল গুপ্ত মহাশয় নিজে যেমন শিক্ষিত ব্যক্তি, সন্তানগণের শিক্ষার জন্যও তাঁহার সেইরূপ আগ্রহ। তাঁহার সহধর্ম্মিনীও বাংলা ভাষায় বিশেষ অনুরাগিণী, এক সময় পদ্য-রচনাও করিতেন। কোন দিন স্কুল-কলেজে না পড়িলেও নিরুপমা বাড়ীতে বসিয়া পিতার কাছে বাংলা ও ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, মাতার দৃষ্টান্তে কবিতা রচনায়ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

নিরুপমা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার পিতা কুচ্‌বিহারের প্রিন্স্‌ হিতেন্দ্র-নারায়ণ ভিক্টরের সহিত তাঁহাব বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহের পূর্ব্বে প্রিন্সের সহিত নিরুপমার সাক্ষাৎ হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চারের সুযোগ ঘটে নাই। পিতা মাতার ইচ্ছানুসারেই এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। নিরুপমার হৃদয় মধ্যে পবিত্র প্রেমের যে আহিতাগ্নি আমরা উত্তরকালে উদ্‌ভাসিত হইতে দেখিয়াছি, এই বিবাহের সময়ে তাহার ক্ষীণতম শিখাটীও বুঝি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই—আর তাহা হয় নাই বলিয়াই বোধ করি একযুগেরও অধিককাল স্বামীর সঙ্গে থাকিয়াও তিনি সুখনীড় গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

প্রিন্স্‌ ভিক্টরের জীবনের ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তাই নিরুপমার ন্যায় প্রেমময়ী রমণীকে তিনি কেন যে সুখী করিতে পারেন নাই, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ডাইভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনিতে গিয়া নিরুপমা তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যাভিচার ও অপর নারীতে আশক্তির যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বিচ্ছেদের একমাত্র সন্তোষজনক কারণ বলিয়াই আমরা মনে করি। তবে এরূপ বড় ঘরের অধিকাংশ পুরুষেরা যে পত্নীর অঞ্চল ধরিয়াই জীবন কাটান না, ব্যাভিচার প্রবৃত্তি তাদৃশ প্রবল না থাকিলেও কেবল মাত্র হাল-চালের ও সম্ভ্রমের দরুণও অনেক সময়ে পরনারীর সংস্রব রাখিয়া থাকেন, নিরুপমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর ইহা অবশ্যই জানা ছিল। আমাদের মনে হয়, ভিক্টর হয়তো নিজের সহিত পত্নীর অনেকটা ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। নানাবিধ সোসাইটীর সঙ্গে মিশিয়া জীবনের যে রস-ঘন আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন, হয়তো পত্নী তাহা হইতেই অধিকতর বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। ভিক্টর পত্নীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেন। স্ত্রীকে স্বাধীনতা প্রদানের যে-সকল দৃষ্টান্ত আমরা কুচ্‌বিহার রাজবংশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, প্রিন্স ভিক্টরের হয়তো সে বিষয়ে কার্পণ্য ছিল!

এই প্রসঙ্গে কুচ্‌বিহারের মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুনীতি দেবীর স্বামী তাঁহাকে লইয়া বিলাত গিয়া তাঁহাকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, অভিজ্ঞাত মহলে তাহা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। স্বীয় আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন যে এক পার্টিতে গিয়া সম্রাটের সহিত তিনি বল্‌-নাচ নাচিয়াছিলেন। এইভাবে লণ্ডনের আরও অনেক বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে তিনি নাচিয়াছিলেন।

ঐ আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন—Thus I was thoroughly spoiled much to the delight of my husband. রাণী সুনীতি দেবী ইহা কি অর্থে লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—পাঠকও হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। এইরূপ সরল উক্তিতে যে সাহসের প্রয়োজন, তাহা কেবল কুচবিহার রাজ-পরিবারের ন্যায় আভিজাত আলোকপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মহিলার পক্ষেই সম্ভবপর। যে আত্ম-চরিত গ্রন্থে এই উক্তিটি লিপিবদ্ধ, সে গ্রন্থখানি স্বর্গীয়া মহারাণী স্বীয় পুত্রবধূর নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

রাজ-পরিবারে বধূমাতার প্রতি শ্বশ্রূর ইহা স্নেহের দান। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বামী পরনারীর সংস্রব বিহীন হইবেন, নিরুপমা ইহাই আশা করিয়াছিলেন।

মহারাণী সুনীতি দেবীর উক্তিটী উদ্ধৃত করিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, একটী অভিজাত বংশের উপরে দোষারোপ করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যাহা অকল্যাণ করা—অভিজাত-গৃহে তাহাই কল্যাণ সূচনা করে। তাহার উপরে আবার সুনীতি দেবী স্বামীর সঙ্গে বিলাত গিয়া সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড প্রমুখ পদস্থ ইংরাজগণের সহিত মেলামিশা করিয়া সেই সমাজেরই অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ ধরণের মেলামিশা সেই সমাজে দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। নজীর স্বরূপ ইংলণ্ডের ভূতপর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর পত্নী মিসেস্ এস্কুইথের আত্মচরিত হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমার শয়ন-গৃহের দেওয়াল বিবিধ জিনিষ-পত্র দ্বারা সাজান থাকিত, প্রসিদ্ধ চিত্রকর Wagnerএর ছবি ও অন্যান্য জিনিষ দেওয়ালের শোভা-বর্দ্ধন করিত। কক্ষের একটী ব্রাকেটে আমি পোষাক-পরিচ্ছদ ঝুলাইয়া রাখিতাম এবং অপর একটী ব্রাকেটে বাইবেল প্রভৃতি থাকিত। নানা-প্রকার চটকদার জ্যাকেট গায়ে দিয়া আমি শয্যায় বসিয়া থাকিতাম আর বন্ধুগণ নিকটে চেয়ার বা সোফায় বসিয়া গল্প-গুজব করিত।"

"চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই আমি যুদ্ধ-ঘোষণা করিতাম, প্রচলিত সংস্কার ও পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সাহসের সহিত লড়াইএ অগ্রসর হইতাম। তাই আমাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তোলা আমার পরিজনবর্গের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মে

আমার মতি ছিল—অবশ্য ধর্ম্মে মতি থাকিলেই যে সৎ হইতে হইবে, একথার কোন মানে নাই (we were deeply relligious but none to infer that we were good.।)

যাহা হোক প্রিন্স ভিক্টরের সহিত বিবাহিত হইয়া নিরুপমা যে কোন দিন আদৌ সুখী হইতে পারেন নাই, এরূপ নহে। স্বামীর অগাধ ঐশ্বর্য্যের যত ক্ষুদ্রতম অংশই তিনি উপভোগ করিয়া থাকুন, সম্রান্ত ও সচ্ছলভাবে জীবন-যাপনের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নিরঙ্কুশভাবে কাব্যচর্চ্চা করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম-স্বামী ভিক্টরের জন্য তাঁহার অন্তরে এতটুকু প্রেমও সঞ্চিত ছিল না, এ কথা বলিলে 'বোধ হয় মিথ্যা বলা হইবে; কারণ ভিক্টরের সহ-বাস কালেই তাঁহার লেখনী প্রেম-মধুর পবিত্র কবিতায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়াছিল :—

"তোমার তরে মোর প্রেম কেমন
জানিতে চাহ বঁধু কেন ?
পাষাণ থানি তলে যেন হেম
পাষাণ হ'য়ে আছে যেন !
বাহিরে কোন রূপ প্রকাশ নাই
হৃদয় ভ'রে উঠে রূপেতে তাই,
গভীর কালো মেঘে গভীরে থাকে জেগে
গোপন সুধা-বারি হেন!"

ভিক্টর-পত্নী রাণী নিরুপমার অর্থসম্পদের বিচিত্র-চিত্র-শোভিত সুশোভন রাজরাজেশ্বর বেশে তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "ধূপ" প্রকাশিত হইল। ধূপের কবিতাগুলিই তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, পরবর্ত্তীকালে প্রকাশিত "গোধূলি" নামক কাব্যগ্রন্থে রচনাশক্তির তাদৃশ উৎকর্ষতা দেখা যায় না।

যাহা হোক্—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাণী নিরুপমা প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার প্রথম স্বামী প্রিন্স হিতেন্দ্রনারায়ণ ভিক্টরের বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনয়ন করেন। ইহাদের বিবাহ ব্রহ্মমতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাই বিচ্ছেদে অসুবিধার কোন কারণ ছিল না। বিচারক বিচ্ছেদ বা ডাইভোর্স মঞ্জুর করিলেন। ভিক্টর ও নিরুপমা কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, এইবারে সে বিচ্ছেদ আইন-সিদ্ধ হইল। বিচ্ছেদের সময়ে নিরুপমার একটী পুত্রসন্তান ছিল।

ছেলেটীকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য তিনি আবেদন করিলেন, কিন্তু আদালত আদেশ দিলেন—পুত্রটী পিতার সঙ্গেই বাস করিবে।

একদল দুষ্ট লোক এইরূপ মিথ্যা গুজব রটনা করিয়া দিয়াছে যে, প্রথম স্বামী ভিক্টরের সহিত বিচ্ছেদ আইন-সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় স্বামী শ্রীযুত শিশিরকুমার সেনের সহিত নিরুপমার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি—একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরে নিরুপমা উদ্বিগ্ন ও উত্যক্ত চিত্তে শান্তিনিকেতনে গমন করিয়া সেখানে কিছুদিন বাস করিতে থাকেন। ঋষি রবীন্দ্রনাথ সানন্দে তাঁহাকে আশ্রমে স্থান দিলেন এবং শান্তিনিকেতনের অধিবাসী ও অধিবাসিনীগণ তাঁহার ন্যায় স্বনাম-খ্যাত মহিলাকে সম্মান ও আদরের সহিত বরণ করিয়া লইলেন। সেখানকার স্বাধীন ও মুক্ত আব্‌হাওয়ায় থাকিয়া নিরুপমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত অনেকটা সমাহিত ভাব ধারণ করিল। যে আনন্দধারা শান্তিনিকেতনে প্রতিমুহূর্ত্তের গতিচ্ছন্দে প্রবাহিত, সেই আনন্দরসে সিক্ত হইয়া নিরুপমা যেন নূতন মানুষটী হইয়া উঠিলেন। জীবনের কোন দুর্য্যোগময়ী রজনীতে যে তিনি কুচবিহার রাজ-পরিবারের জটিল আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন সে-কথা তিনি ক্রমে ভুলিয়া গেলেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে—বাঙালীর হিসাবে নারী-জীবনের প্রায় তৃতীয় পাদ অতিক্রমণের পরে—কৌমার্য্য যেন নূতন করিয়া তাঁহার অন্তর-মন সিক্ত করিল।

এই সময়ে শ্রীযুত শিশিরকুমার সেনগুপ্ত নামক এক যুবক শান্তি-নিকেতনে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত নিরুপমার পরিচয় হইল এবং এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে এক পবিত্র দিবসে শান্তিনিকেতনের ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জে বসিয়া শিশিরকুমারের সহিত নিরুপমার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। শোক-বিদগ্ধ মরুভূমি সুশীতল জল-সিঞ্চনে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়া আবার শ্যামলশ্রীমণ্ডিত নবাঙ্কুরে ভরিয়া উঠিল।

তদবধি নিরুপমা মনোসুখে নূতন স্বামীর ঘর করিতেছেন, নানাবিধ সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে নিরুপমার নিমন্ত্রণ হয়, দ্বিতীয় স্বামী শিশিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া তিনি ঐ সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সেন-দম্পতির ন্যায় সুখী দম্পতি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিন্দুবিশ্বল+কৃপাসিন্ধু মিশ্র

শ্রীযুত ভাবগ্রাহী বিশ্বল উৎকলের কায়স্থ। ভাবগ্রাহী নিজ উপার্জনে ধনবান হইয়াছেন। পুরীতে ধনবান অতি মুষ্টিমেয়। ঈর্ষায় প্রতিবেশীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা প্রচার করিত, তাঁহার বিবাহটাকেও লোকে নানাপ্রকার রং চড়াইয়া সুনামের হানি করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

বিশ্বল মহাশয়ের দুইটী পরমা সুন্দরী কন্যা। পুরীতে বাল্য বিবাহ—বাল্য বিবাহইবা বলি কেন—শিশু বিবাহ প্রচলিত ছিল। দুষ্ট লোকের নানাপ্রকার প্রচারের ফলে ভাবগ্রাহী ১৬।১৭ বৎসর বয়সেও কন্যা শ্রীমতী বিন্দুবিশ্বলের জন্য উপযুক্ত বর পাইলেন না।

বহু যুবক বিন্দুকে দেখিয়া মোহিত হয়, তাহাকে বিবাহ করিতেও চায় কিন্তু অভিভাবকের অনিচ্ছায় মনের বাসনা পূরণ হয় না।

শ্রীযুক্ত মিশ্র উৎকলের নিষ্ঠাচারী উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পুরীতে এই মিশ্র পরিবার বহুকাল যাবৎ বাস করিতেছেন। ইহারা পুরীর অধিবাসী হইয়া গিয়াছেন। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। মিশ্র লেখা পড়ায় বিশেষ ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। বিন্দুকে দেখিয়া মিঃ মিশ্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। মিশ্র ঐ সময়ে বি, এ পড়িতেন। তাঁহার এক ভাই পুরীতে ডাক্তারী করেন। কৃপাসিন্ধু ও বিশ্বল পরিবারের পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল—তিনি এই পরিবারে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে ইহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজেরাই বিবাহ-ঠিক করিয়া ফেলে। ভাবগ্রাহী মহাশয়ও মিঃ মিশ্রকে কন্যা দান করিতে মনস্থ করিলেন। ভাবগ্রাহী বলিতেন—জাত আমার ব্যাঙ্কে। 'ব্যাঙ্কে টাকা আছে, জাত নিবে কে!' হইলও তাহাই—নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইয়া গেল। বর পক্ষের অভিভাবকের বিবাহে সম্মতি ছিল না।

বিবাহের পর মিশ্র সুনামের সহিত বি, এ পাশ করিয়া শ্বশুরের অর্থে আই, সি, এস্ পড়িতে বিলাত গেলেন। কোন কারণে শ্বশুরের অর্থে বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহ তাঁহার ঘটিল না। মিশ্র চোখে অন্ধকার দেখিলেন।

মিঃ মিশ্রের বন্ধু শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বড়াল কার্য্যোপলক্ষে তখন বোম্বাই বাস করিতেন। মিশ্র বন্ধুর শরণাপন্ন হইলেন। বড়াল প্রকৃত বন্ধুত্ব দেখাইলেন। তিনি প্রতি মাসে বন্ধুর আবশ্যকীয় অর্থ যথা সময়ে বিলাত

পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। মিঃ মিশ্র যথাসময়ে আই, সি, এস্ পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন।

ভাবগ্রাহীও তখন জামাতার বিলাত বাসের যাবতীয় ব্যয় এক সঙ্গে চুকাইয়া দেন।

উৎকলের প্রথম সিভিলিয়ান বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই অসবর্ণ সখ্য-বিবাহ করিয়া বেশ শান্তিতে আছেন। একে সিভিলিয়ান তদুপরি অসবর্ণ বিবাহ—এজন্য সমাজে তিনি চলিতে পারেন নাই বটে তবে তাঁহার মান মর্য্যাদা যে যথেষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমতী বিন্দুর কনিষ্ঠা সহোদরা কনক রাভেনস কলেজে পড়িতেছে। বিন্দু বিবাহের সময় পর্য্যন্ত সামান্য লেখা পড়া জানিতেন—বর্ত্তমানে তিনি লেখা পড়ায় মন দিয়াছেন।

প্রভাবতী দেবী + মকবুল আলি

শ্রীমতী প্রভাবতীর স্বামী ছিলেন বৈদ্য সন্তান, প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রভাবতী পাশ করা ধাত্রী, তাঁহার স্বামী তেমন বিশেষ কিছু করিতেন না। প্রভাবতী হাওড়ায় থাকিয়া ধাত্রীর ব্যবসা করিতেন।

ধাত্রী-বিদ্যায় রূপের কোন প্রয়োজন না থাকিতে পারে কিন্তু সুন্দরী ধাত্রীগণ সাধারণতঃ ব্যবসা আরম্ভ করিয়াই আসর জমাইয়া ফেলিতে পারেন—একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। চাকরী পাইবার পক্ষেও ধাত্রীর রূপযৌবন অনেক সাহায্য করে। অনেক ডাক্তারই রূপসী সুন্দরী ধাত্রীকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। প্রভাবতী দেবী খুব সুন্দরী না হইলেও কুৎসিত ছিলেন না। যৌবনে তাঁহাকে সুন্দরীও বলা যাইত। নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্ম ধাত্রী বলিয়াই হউক অথবা তাঁহার বিদ্যার পারদর্শিতার জন্যই হউক, হাওড়ায় তাঁহার বেশ পশার জমিয়াছিল। ডাক্তারদিগের কেহ কেহ যেমন তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, জন সাধারণও তাঁহাকে পছন্দ করিত।

প্রভাবতী ক্রমে তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। ধাত্রী-দিগের সন্তান পালন ও গৃহস্থালীর কাজ সাধারণতঃ স্বামী করিয়া থাকেন।

প্রভাবতীর স্বামীও এই সকল কার্য্য এবং হাট বাজার ইত্যাদি নিজেই করিতেন। রান্নাও অনেক সময় তাঁহাকেই করিতে হইত। কাজে ত্রুটি হইলে স্বামী যেমন স্ত্রীকে কোন কোন সময় ভর্ৎসনাও করেন, ধাত্রীদিগের বেলায় ঠিক তাহার বিপরীত।

স্বামী-স্ত্রীতে তাহাদের ভালই কাটিতেছিল। স্বামী প্রভাবতীকে কখনও অবিশ্বাস করিতেন না বটে কিন্তু রাত্রিতে 'ডাক' আসিলে তিনি একা ছাড়িয়া দিতেন না, সঙ্গে নিজে যাইতেন। কোন ডাক্তারের সঙ্গে রাত্রিতে যখন 'কলে' যাইতেন তখন প্রভাবতী বলিতেন—'তোমার আর সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন কি, ডাক্তার বাবুইতো আছেন'। স্বামী আর কি করিবেন, চুপ করিয়া চলিয়া আসিতেন। স্ত্রী বলিতেছেন—ডাক্তার বাবু সঙ্গে আছেন, আর ভয় কি, ইহার পরও যদি স্বামী সঙ্গে যাইতে চান তবে ডাক্তার বাবুকে অবিশ্বাস করা হয়। ধাত্রী-স্বামীর ডাক্তার বাবুকে অবিশ্বাস করা চলে না।

এইভাবে স্বামী স্ত্রীতে এক রকম চলিয়া যাইতেছিল। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে প্রভাবতী বিধবা হইলেন। বিধবা হইবার পর কিছুদিন তাঁহাকে ব্যবসায়ে কিছু অমনোযোগী দেখা গিয়াছিল। শোকাবেগ কমিয়া গেলে তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে ব্যবসা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সৌন্দর্য্যও ধাত্রীদের উপার্জ্জনের একটা বিশেষ সহায়। স্বামী জীবিত থাকিতে তিনি যেমন বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য করিতেন বিধবা হইবার পরও তাঁহার সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ এবং পাঁচটী সন্তানের জননী হইলেও তিনি যখন সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইতেন, তাঁহাকে যুবতীর মতই দেখাইত। বিধবা হইবার পর তিনি নানা রকম প্রসাধনের জিনিস দ্বারা মুখটা এনামেল করিয়া লইয়া বাহির হইতেন। এ বয়সেও তাঁহার কাঁচুলি পরিবার সখ ছিল।

এই সময়ে তাঁহার বড় পুত্রের বয়স পনের কি ষোল, এবং বড় কন্যার বয়স চৌদ্দর উপরে। বড় ছেলেটী হাওড়ায় পড়িত।

বর্দ্ধমান জিলার একটী দরিদ্র মুসলমান বালক প্রভাবতীর পুত্রের সহপাঠী ছিল। এই ছেলেটীর নাম মকবুল আলি। পুত্রের সঙ্গে মকবুল তাহাদের বাড়ী আসিত। মকবুলও প্রভাবতীকে মা সম্বোধন করিত। মকবুল ধর্ম্ম-মাতা প্রভাবতীর ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার একটু যত্ন নিতেন। মকবুল এমন দরিদ্র ছিল যে তাহার থাকিবারও ঠাঁই ছিল না। দরিদ্রের দুঃখে প্রভাবতীর করুণা হইল। পুত্রের

সহপাঠীকে প্রভাবতী আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহে বাড়ীতে স্থান দিলেন। (মকবুল এ বাড়ীতে স্থান পাইয়া প্রভাবতীকে ধর্ম্ম-মাতা সম্বন্ধ স্থাপন করেন) হাওড়া হইতে মকবুল ও প্রভাবতীর পুত্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল। প্রভাবতীর পুত্র হাওড়া হইতে কলিকাতায় আসিতেন, মকবুল কোন মুসলমান ফণ্ডের সাহায্যে কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন। ছুটীর দিন মকবুল তাঁহার এই ধর্ম্ম-মাতার বাড়ী যাইয়া থাকিতেন। এইভাবে আই, এ, পাশ করিলেন।

প্রভাবতীর তিন কন্যাই লেখা পড়ায় ভাল ছিল। বড় মেয়ে তখন আই, এ পাশ করিয়াছে, ছোট ম্যাট্রিক পড়েন। মকবুল ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যে কারণেই হউক মেয়েটী এ বিবাহে রাজি হইল না।

মকবুলের বাসনা পূরণ না হওয়ায় প্রায় এক মাস তিনি আর প্রভাবতীর বাড়ী গেলেন না। প্রভাবতী তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া মকবুলকে ডাকিলেন। মকবুল তাঁহার মা'র নিকট যাইতে একটু লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া ব্রাহ্মকন্যার পাণি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে হয়ত প্রভাবতী বিরক্ত হইয়াছেন—তাহাকে তিরস্কার করিবার জন্যই বোধ হয় ডাকিয়াছেন। মকবুল ভয়ে ভয়ে এই অন্ন-দাতৃ মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মকবুল প্রভাবতীর নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন—"খুকী তোমায় বিবাহ করিল না বলে তুমি আর আমার বাড়ী আস না! সেজন্য দুঃখিত হইও না, আমিই তোমাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, আজ হইতেই তুমি আমার স্বামী।"

বয়স্কা কন্যাদ্বয় এবং পুত্রের উপস্থিতিতেই প্রভাবতী অতি গম্ভীর ভাবে একথাগুলি বলিলেন। পুত্র বা কন্যা কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না, তাহারা ভাবিল মা বুঝি পাগল হইয়াছেন। এই সময় প্রভাবতীর বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। প্রভাবতীর পুত্র কন্যাগণ ভাবিলেন—মা হয়ত একটা কথামাত্র বলিয়াছেন, ইহা আর কিছুই নহে। এই সময় মকবুল বি এল পাশ করিয়াছেন।

মকবুল পূর্ব্বেও যেমন প্রভাবতীর বাড়ী গেলে দুই একদিন থাকিতেন এবারও রহিয়া গেলেন। তাঁহার জন্যও রান্না হইল। প্রভাবতী ঐ দিন অন্য ঘরে শয্যার বন্দোবস্ত করিলেন। কন্যাগণ তখনও কিছু মনে করিতে পারেন নাই। রাত্রির আহারের পরে প্রভাবতী যখন

মকবুলকে ডাকিয়া লইয়া এক শয্যায় শয়ন করিলেন তখন সকলের চমক ভাঙ্গিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। এই ভাবে হাওড়াতেই কয়েকদিন কাটিল। অনন্যোপায় হইয়া কন্যাদ্বয় কলিকাতায় হোটেলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। পুত্রগণ মাতার আশ্রয় ত্যাগ করিল।

মকবুলের বয়স এই সময় ছাব্বিশ কি সাতাশ। বি, এল পাশ করিয়া মকবুল যশোহরে প্র্যাকটিশ করিতে গেলেন। প্রভাবতীও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তখন তিনি ধাত্রীর ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যশোহরে প্র্যাকটিশ করিলেও মাঝে মাঝে তিনি কলিকাতায় আসিতেন এবং ছোট খাট দুই একটী মোকদ্দমায়ও তিনি এখানে পাইয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের একটী মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে মকবুলের পরিচয় ছিল। ঐ চামড়া ব্যবসায়ীর সোনাগাছির এক বারবনিতা রক্ষিতা ছিল। পরে তাহাকে ঐ চামড়া ব্যবসায়ী মুসলমান করিয়া নিকাহ্ করেন। পত্নীর সঙ্গে তাহার স্বামীর বনিবনাও হইতেছিল না। ঐ চামড়া ব্যবসায়ী উকিল মকবুল দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের এক দরখাস্ত করেন, যথাসময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মকবুলের সঙ্গে এই নারীর পরিচয় ঘটে। ঐ নারী মকবুলকে তাহার একটা সুরাহা করিতে বলে। তাহার অনেক গহনা-পত্র ছিল এবং সে সুন্দরী। তখন তাহার বয়স ছিল মকবুল হইতে দুই তিন বৎসর কম। এই অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না। বিবাহ বিচ্ছেদের তিন মাস মধ্যে বিবাহ চলে না; তিন মাস পরে মকবুল এই নারীকে বিবাহ করিলেন।

প্রভাবতী যশোহরে থাকিয়াই এ খবর পাইলেন। মকবুল যশোহর গিয়া প্রভাবতীর নিকট নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে প্রভাবতী মারা যান। এ-পক্ষে তাঁহার আর সন্তান হয় নাই।

প্রভাবতীর পুত্র কন্যাগণ জীবিত আছেন। কন্যাদ্বয় গ্রাজুয়েট।

সম্ভবতঃ ১৯১২ সনে মকবুল প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। পূর্ব্বোক্ত নারীরও কোন সন্তান হয় নাই। তিনি এখন খাঁটি মুসলমানের ন্যায় নামাজ পড়েন এবং মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মকবুল এখন কলিকাতায় ওকালতি করিতেছেন।

সমাজে প্রভাবতীর পুত্র কন্যাগণের মাথা হেঁট হইতে পারে মনে করিয়া আমরা স্বামী স্ত্রীর নাম একটু রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। তদানিন্তন কোন মুসলমানের সাপ্তাহিকে এই সকল কাহিনী মুদ্রিত হইয়াছিল। পাত্র পাত্রীর প্রকৃত নাম জানিতে ইচ্ছা করিলে The Musalmanএর Editorial staff এ খোঁজ করিতে পারেন।

ঊষারাণী দেবী+নির্ম্মল রায় চৌধুরী

শ্রীমতী ঊষারাণী দেবী কলিকাতা হুগলকুঁড়ের দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। দীননাথ বাবুর পুত্র বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মল রায় চৌধুরীর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। চন্দ্রনাথ তাহার বন্ধুকে পিতা মাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিবার জন্য বাড়ী নিয়া আসেন। এই বন্ধুত্ব সূত্রে নির্ম্মল চন্দ্রনাথের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। চন্দ্রনাথের বাপ মা নির্ম্মলকে খুব স্নেহ করিতেন। নির্ম্মলের ভগিনী ঊষার তখন বয়স ছিল ১৫।১৬ বৎসর, সে লেখা পড়া করিতেছিল। নির্ম্মল তাকে ইংরেজী পড়াইত, আঁক শিখাইত। নির্ম্মলের নিটক ঊষা পড়িতে খুবই পছন্দ করিত।

ঊষার তখন বিবাহের বয়স হইয়াছে। তাহার বিবাহের কয়েকটা সম্বন্ধও আসিল। বরের অভিভাবক এমন দাবী করিতেন যে তাহা পূরণ করিবার মত ক্ষমতা দীননাথের ছিল না। যে সম্বন্ধই আসে তাহা একমাত্র দাবী মিটাইতে না পারার জন্যই কার্য্যে পরিণত হয় না।

নির্ম্মলের ইচ্ছা ছিল ঊষাকে সে বিবাহ করিবে। উভয়েই যে পরস্পরের প্রতি একটু আকৃষ্ট না হইয়াছিল তাহাও নয়। মুখ ফুটিয়া তাহারা এ বিষয়ে কিছু না বলিলেও ঊষার সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা সুখী বই অসুখী হইত না।

চন্দ্রনাথ যখন অন্য কোথায়ও ঊষার বিবাহ ঠিক করিতে পারিলেন না তখন নির্ম্মলকেই তিনি কন্যা দান করিবেন স্থির করিলেন। এই প্রস্তাবে নির্ম্মল ও ঊষা উৎফুল্ল হইলেন—নির্ম্মলের অভিভাবকদেরও অমত হইল না। কিন্তু শেষটায় আর মিলন সম্ভব হইল না, আট্‌কে গেল বামুনদের ঐ 'যোটক' বিচারে। উভয়েই প্রাণে খুব আঘাত পাইলেন কিন্তু সমাজবিধি লঙ্ঘন করিবার মত শক্তি তখনও তাঁহাদের ছিল না।

দীননাথবাবুও কন্যার বিবাহে এক প্রকার হতাশ হইয়া পড়িলেন। আবার বরের খোঁজ আরম্ভ হইল। দুই তিন মাস মধ্যেই তারকেশ্বরের সুনীল ডাক্তারের সঙ্গে ঊষার বিবাহ হইয়া গেল। নির্ম্মলের বুকটা ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার আর অন্য বিবাহে মন উঠিল না। খাগরিয়ার চাকরী স্থলে কোন প্রকারে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ঊষাকে তিনি একদিনের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না।

ঊষা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল কিন্তু দাদার বন্ধু নির্ম্মলকে একেবারে ভুলিতে পারে নাই। বিবাহের দেড় বৎসরের মধ্যেই ঊষা বিধবা হইল। খাগরিয়ায় এই সংবাদ নির্ম্মলের নিকট পৌছিলে নির্ম্মল সুখী হইয়াছিলেন কি দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা জানেন একমাত্র ভগবান।

নির্ম্মল অবিলম্বে ছুটি নিয়া ঊষাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিলেন। ঊষার বাড়ীতে যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চলিল। উভয়েরই মন দে'য়া নে'য়া হইয়া গেল। সব ঠিক—এবার হিন্দু সমাজের তুচ্ছ একটা যোটক বিচারে আর বাধা দিতে পারিল না। ভগবান তাহাদের সহায় হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। বৈধব্য যন্ত্রণা তাহার বেশী দিন সহিতে হইল না।

এক নূতন যন্ত্রণা আবার উষাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এ বিবাহের পরই দুষ্ট লোকে রটনা করিতে লাগিল যে উষা 'তুক্‌তাক্' করে সুনীলকে মেরে ফেলেছে নির্ম্মলকে বিয়ে করবার জন্য। নির্ম্মলকে বিবাহ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ কথা কেহ বলে নাই।

উষা তাহার স্বামীর সঙ্গে আছেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান জীবন নাকি সুখময় হইয়াছে। সমাজ তাঁহাদের গ্রহণ করেন নাই। উষার শ্বশুর বাড়ী হালিসহরে।

মালতী সেন+নবকৃষ্ণ চৌধুরী

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে নারী বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সমস্ত দেশে এক নূতন যুগের নূতন হাওয়া বহিতেছে। অন্তঃপুরে বহু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে শান্ত সমাহিত পবিত্র আদর্শ, যে ধর্ম্মচর্চ্চা, যে ভগবদ্ভক্তির ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কল্যাণ ও মাধুর্য্যে ভরা। তাহাতে মনের বিকাশের সুযোগ আছে, কিন্তু নারীর বাহিরে আসিবার শিক্ষা নাই। এই শিক্ষা যে-দিন হইতে নারী পাইতে লাগিল, সে-দিন তাহাদের যে শক্তি স্ফুরণের মত হইয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মত প্রবলবেগে বাহির হইয়া বহির্জ্জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দলে দলে পুরুষ এই মুক্তি যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিতেছে দেখিয়া, শক্তিময়ী নারী কি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল? সেও তাহার প্রকৃতিদত্ত শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিল। পুরুষের শক্তি ও সাহসকে দ্বিগুণীত করিয়া সে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমভাবে কার্য্য আরম্ভ করিল।

কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারী তাহার ক্ষমতার পরিচয় দিল না, শিক্ষায়-দীক্ষায় সমাজের পুরাতন বিধি-নিষেধকে ছিন্ন করিতেও সে অগ্রসর

হইল। সমাজের পুরাতন বিধি, গতানুগতিক প্রথায় বিবাহের ধারা এতদিন ধরিয়া পুরুষই অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিল, এখন নারীও পুরুষের অগ্রগতির সহিত যেন সমানতালে চলিতে লাগিল।

শ্রীযুক্তা মালতী সেনের জীবনই ইহার একটী দৃষ্টান্ত। বাল্যকাল হইতেই এই মহিলার হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার আকাঙ্খা ছিল। নানা প্রতিকুল অবস্থার জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিল না। তাঁহার অগ্রজ ছিলেন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, এজন্য তাহার সেই ইচ্ছাকে দমন করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনে পড়িতে যাইয়া সে তাহার আন্তরিক বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী বন্ধুর অভাব উপলব্ধি করিল।

শান্তি নিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ললিত কলা, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চা থাকিলেও স্বদেশ-প্রীতির সেখানে খুবই অভাব। নবকৃষ্ণবাবুর প্রাণে মালতী স্বদেশ-প্রীতির আভাস পাইল। তাঁহারা উভয়ে উভয়কে চিনিলেন কিন্তু ভাষায় তাহা প্রকাশ করিলেন না। একটু অনুরাগের সঞ্চার হইল মাত্র।

নবকৃষ্ণ চৌধুরী উৎকল নেতা গোপবন্ধু চৌধুরীর কনিষ্ঠ সহোদর। গোপবন্ধুর পিতা গোকুলানন্দ চৌধুরী ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। জাতিতে ইহারা কায়স্থ। কি শিক্ষা দীক্ষায়, কি স্ত্রী-স্বাধীনতায় ইহারা উৎকলের মধ্যমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চৌধুরী পরিবারের মান সম্ভ্রম পদ-মর্য্যাদা ভারত বিখ্যাত।

নবকৃষ্ণ চৌধুরী তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে এই চৌধুরী পরিবারের সকলেই যোগ দেন। এই সময় নবকৃষ্ণও কলেজ ছাড়িয়া দেশের কাজে লাগিয়া যান। ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত নবকৃষ্ণ কংগ্রেসের কার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যে ইনি কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছেন।

এই চৌধুরী পরিবারের বাড়ী কটক টাউনের উপর। ইহাঁরা উড়িয়া

হইলেও সকলেই বেশ ভাল বাঙ্গলা বলিতে পারেন। অবশ্য উৎকলবাসীর নিকট তাঁহারা বাংলা ভাষা বলেন না।

কংগ্রেসের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবকৃষ্ণ আবার পড়িতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার চাকরী করিবার জন্য পড়িবার প্রয়োজন ছিল না, তাহাতে প্রবৃত্তিও ছিল না। শান্তিনিকেতনে যাইয়া তিনি জ্ঞানচর্চ্চা করিতে মনস্থ করিলেন।

শান্তি নিকেতনে বেশ মনোযোগের সহিত তিনি কয়েক মাস পড়িলেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এক উৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয় হয়। কটকে রাষ্ট্র যে—এই অভিনয়ে নবকৃষ্ণ এক ভূমিকায় নায়ক ও মালতী সেন নায়িকার অভিনয় করেন। উৎকলবাসীর বাংলা অভিনয় এমন সুন্দর হইয়াছিল যে সকলেই নবকৃষ্ণের প্রসংশা করেন। নায়িকার ভূমিকায় মালতী এমন অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে নাটকের নায়িকা বলিয়া কেহই মনে করিতে পারে নাই, আদর্শ পত্নীর মতই তাঁহাকে মানাইয়াছিল। কোন্ অভিনয়ে তাঁহারা নায়ক নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—নবকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল মৃদু হাসেন, কোন উত্তর দেন না।

মালতী বৈদ্য বংশের সন্তান। তাঁহার অগ্রজ কলিকাতা গড়পারে বাস করেন। মালতী শিক্ষা-ব্যপদেশেই শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ মালতীকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মালতীর গায়ের রং একটু ময়লা হইলেও শরীরের গঠন কুৎসিত নহে। চোখ দুটী বেশ উজ্জ্বল। নবকৃষ্ণ ও মালতী উভয়েই প্রায় সমবয়সী—

কংগ্রেসের কার্য্যে মালতীও কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছেন। মালতী একদিকে লেখা পড়ায় যেমন বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—আধুনিক নাচ গান, সূচী কার্য্য প্রভৃতিতেও শান্তিনিকেতনের কোন মহিলা দইতে কম ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ মহিলা যেমন পদ্য মিলাইতে পারেন ইনিও তেমনি পারিতেন। বর্ত্তমান সময়ে

মালতী উৎকল সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেছেন—তবে ইহা নাকি তাঁর ভাল লাগে না।

ক্রমে উভয়েরই পাঠে অমনোযোগ দেখা যাইতে লাগিল। একে অন্যের প্রতি বেশ একটু অনুরাগী হইল।

নবকৃষ্ণের এক বন্ধু শান্তিনিকেতনেই এই বিবাহ সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। শান্তিনিকেতনে পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে করিতে হয়। গোপবন্ধু ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উভয়ে কলিকাতা যাইয়া হিন্দুমতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর তাঁহাদের উভয়েরই পাঠ শেষ হইল। নবকৃষ্ণ এক বৎসরও শান্তিনিকেতনে ছিলেন না।

শ্রীনিকেতনেও ইহারা কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীনিকেতনের কার্য্যের পরই তাঁহারা কলিকাতায় আসেন।

এই বিবাহ নবকৃষ্ণের আত্মীয়গণ সমর্থন করেন নাই। পরিবারেও তাঁহাদিগকে প্রথম পৃথকভাবেই থাকিতে হইয়াছিল—বর্ত্তমান সময়ে পরিবারে এক প্রকার চলিয়া গিয়াছেন।

বিবাহের পর ইহাদের কয়েকটী সন্তান হইয়াছে। উভয়ে আবার দেশের কাজে যোগ দিয়াছেন।

বাঙ্গালী বৈদ্য কন্যার সঙ্গে উড়িয়া কায়েস্থের এই প্রথম বিবাহ। অসবর্ণ ও দুই প্রদেশের বর কন্যার মিলন উড়িয়া সমাজে এখনও প্রচলন হয় নাই—এজন্য সমাজে ইঁহাদের এখনও স্থান হয় নাই। উড়িয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহাদের সন্তানগণ কোন জাতি হইবে ?

এই দম্পতি ব্রাহ্মমতে পরিণীত না হওয়ায় শান্তিনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি দুঃখিত।

সুকুমারী দত্ত+গোষ্ঠবিহারী দত্ত

অনেকদিন আগেকার কথা বলিতেছি।

কলিকাতার থিয়েটার গুলি তখন আজিকার মত সুশৃঙ্খল ছিল না। থিয়েটারের আশেপাশে তখন কত গুলি 'কাপ্তান' বা 'বাবু' আসিয়া জুটিতেন—সুযোগ পাইলেই তাঁহারা অভিনেত্রীদের লইয়া ভাগিয়া পড়িতেন। আজিকার অভিনেত্রীদের ন্যায় স্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিত্ব বোধ তখনকার অভিনেত্রীদের ছিলনা; তাঁহারা অভিনয় করিতেন বটে, কিন্তু অভিনয় অপেক্ষা কাপ্তান জুটাইববার বাসনাই ছিল তাহাদের মনে অধিকতর প্রবল। শাঁসালো কাপ্তান পাইলে যে-কোন মুহূর্ত্তে থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বেমালুম সরিয়া পড়িতে তাঁহাদের দ্বিধা ছিল না।

স্বর্গীয় উকীল ৺ শ্রীনাথ দাসের পুত্র বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস তখন থিয়েটার গুলির সহিত বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। থিয়েটারের ঐ অসুবিধা দর্শনে তিনি প্রস্তাব করিলেন—অভিনেতারা অভিনেত্রীদের বিবাহ করুণ, তাহা হইলে আর অসুবিধা থাকিবে না।

কিন্তু এ প্রস্তাব কার্য্যে পারিণত করা সহজ-সাধ্য হইল না। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে কোন্ অভিনেত্রী রাজী হইবেন? আর যদিই বা কেহ রাজী হ'ন ত কোন্ অভিনেতা বংশ-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবে?

মিস্ গোলাপী তখন ষ্টার থিয়েটারের বিখ্যাতা অভিনেত্রী; ঐ থিয়েটারেরই অভিনেতা বাবু গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয়। এই প্রণয়ী যুগল উপেনবাবুর প্রস্তাব মত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন। উপেনবাবুর উদ্যোগে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মিস্ গোলাপী পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া মিসেস্ সুকুমারী দত্ত নাম গ্রহণ করিলেন—থিয়েটারের দর্শকদের কাছে এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

বিবাহের পরে সুকুমারী স্বামী সঙ্গে আমরণ অভিনয় করিয়াছেন; কিন্তু স্বামী ব্যতিরেকে অপর কোন পুরুষকে নিজের ঘরে স্থান দেন নাই।

ধৈর্য্যবালা দাসী+এস্ রায়

ধৈর্য্যবালা দাসী কিশোরগঞ্জের কোন বৈষ্ণবীর কন্যা। তাহার পিতার নাম অজ্ঞাত। সে পরমা সুন্দরী; মফঃস্বলে এরূপ সুন্দরী দুর্লভ। পরিনত বয়সে সে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছে।

ধৈর্য্যবালার যৌবন যখন প্রায় অতিক্রান্ত, তখন এস্ রায় নামক এক তালুকদার তাহার গৃহে অতিথি হয়। ধৈর্য্যবালার রূপে আকৃষ্ট হইয়া রায়-নন্দন তাহার প্রেমে পড়েন। ইনি ধনী-পুত্র; কিশোরগঞ্জের পাট তুলিয়া দিয়া ধৈর্য্যবালা তাহার সহিত ঢাকায় চলিয়া আসে। সেখানে গ্রীন্ বোটে দুইজনে অনেক দিন বস-বাসের পরে রায় মহাশয় আর্য্য-সমাজী মতে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন।

সুজাতা রায়+সত্যেন্দ্র রায়

শ্রীমতী সুজাতা রায় শ্রীযুত শশী ভূষণ বসুর কন্যা। সুজাতা ঢাকার এক মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। সত্যেন বাবুও ঢাকার এক কলেজের প্রফেসার, পূর্ব্বে শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সম্পর্কে ইহারা পিস্তুত মামাত ভাই বোন, উভয়েই ব্রাহ্ম—বিশেষ আলোক প্রাপ্ত।

ইঁহাদের শৈশবের স্নেহের বন্ধন প্রেমের বন্ধনে পরিনত হয়; অবশেষে নিজেরা স্থির করেন যে পরস্পরের সহিত বিবাহিত হইবেন। এদেশে বসিয়া বিবাহ করিতে গেলে গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে ভাবিয়া অধ্যাপক রায় ভগিনী সুজাতাকে লইয়া বিলাত চলিয়া যান। সেখানে ইহাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বিবাহের সংবাদ পূর্ব্বে ঘরের লোকদের দেওয়া হয় নাই—বিলাত হইতে ভাই বোন স্বামী-স্ত্রী রূপে ফিরিয়া ইঁহারা সকলকে তাক্ লাগাইয়া

দেন। তখন হাতের পাশা উল্টিয়া গিয়াছে, তাই স্বজনবর্গকে ব্যাপারটা সহিয়া যাইতেই হইল। ইঁহাদের জীবন যে সুখময় তাহাতে সন্দেহ নাই—

অধ্যাপক সত্যেনবাবু ও শিক্ষয়িত্রী সুজাতার আদর্শ-প্রেমে ছাত্র ছাত্রীগণ শিখিবে ভাল।

পদ্মকুমারী ঘোষ+বীরেশ্বর ঘোষ

শ্রীমতী পদ্মকুমারী সিংহ হিন্দু কায়েস্থের কন্যা, অভিভাবকগণ তাঁহাকে স্কুলেও কলেজে পড়িতে দিয়াছিলেন, স্বীয় মেধা বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ডিগ্রী লাভের পরে বাইশ বৎসর বয়সে শ্রীযুত বিরেশ্বর ঘোষ মজুমদার নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর পদ্মকুমারী স্বামীর সহিত কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু বিবাহের প্রথম বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়বর্গের সঙ্গ তাঁহার নিকট অসহনীয় হইয়া উঠে। উহাদের হাত এড়াইবার জন্য তিনি উপায় খুঁজিতে থাকেন। আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া অতঃপর মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবার সঙ্কল্প করেন।

১৯২৯ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে (একা কিংবা অপর কাহারও সহিত জানা যায় নাই) পদ্মরাণী কলিকাতার বিখ্যাত 'নাখোদা মস্‌জিদে' চলিয়া যান এবং তথায় তিনি "পবিত্র ইছলাম ধর্ম্মে" দীক্ষিতা হন। ইছলাম ধর্ম্মের "সুশীতল আশ্রয়ে" আসিয়া তাঁহার নূতন নামকরণ হয় আয়েষা বিবি। আয়েষা বিবি একটী মুসলমান বালিকা

বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া "স্বতন্ত্রভাবে" বাস করিতে থাকেন।

অতঃপর একদিন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি প্যাংক্রিজের এজলাসে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা একটী যুবতীকে বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত সহ হাজির হইতে দেখা যায়। কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া যুবতী বলেন যে, তাঁহার নাম শ্রীমতী আয়েষা বিবি। বয়স তাঁহার বাইশ কি তেইশ। পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল যথাক্রমে মিস্ পদ্মকুমারী সিংহ ও মিসেস্ পদ্মকুমারী ঘোষ মজুমদার। স্বামী-গৃহের অবরুদ্ধ আব্‌হাওয়া সহ্য না হওয়ায় নাখোদা মস্‌জিদে কল্‌মা পরিয়া পবিত্র ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তির শীতল বায়ু সেবনে শরীর ও মন ঠাণ্ডা করিয়াছেন। স্বার্থপরের মত একাই সে নূতন ধর্ম্মাশ্রয়ের সুশীতল ছায়া আগ্‌লাইয়া রাখিতে চাহেন নাই—স্বামীকেও উহার অংশ লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত পরি-পরিতাপের বিষয় ইছলাম ভজনের সুমতি স্বামীর হয় নাই। তাই অগত্যা তিনি কাফের স্বামীর স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছেন—আদালত যেন মেহেরবানি করিয়া ডাইভোর্স মঞ্জুর করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আয়েষা বিবির পক্ষ হইতে ব্যারীষ্টার ৮ আই বি সেন আদালতে হাজির ছিলেন। যুবতীর অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া তিনি ডাইভোর্সের সাপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। অতঃপর জজ্ সাহেব আয়েষা বিবিকে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে বিবিজান বলেন যে তাঁহার পিতামাতা হিন্দু ছিলেন। বিবাহের এক বৎসর পরে তিনি মুছলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে বিবাহিত জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রশ্ন—আপনিই কি আপনার স্বামীকে মুছলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন?

উত্তর—করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ কি?

উত্তর—আমার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। আমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকের কাছেও এমন কি স্বামীর কাছে সহানুভূতি পাইতাম না।

পদ্মকুমারীর স্বামী এই মামলায় আপত্তি কিংবা কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই।

বলা বাহুল্য আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করেন। অতঃপর বিবি-জান বিজয়িনী বীরাঙ্গনার ন্যায় আদালত কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তুর্কী টুপী ও ফেজের বাহুল্য যেন বিরাট বিজয়োল্লাস সূচিত করিতেছিল। যাইবার সময়ে বিবি সাহেবার চওড়া লাল পেড়ে শাড়ীতে যেন বেশ একটু দোল্ খেলিল, দেখিয়া দর্শকদের মনে হইয়াছিল—এ দোলটুকু যেন বিবিজানের পরিত্যক্ত হিন্দু-স্বামীর প্রতি বিদ্রূপ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গ্র্যাজুয়েটের মহিমা প্রকাশ করিয়া গেল।

লিলিয়ান্ পালিত

লিলিয়ান পালিত দানবীর মহাপ্রাণ স্বর্গীয় স্যার তারকনাথ পালিতের কন্যা। তিনি উচ্চশিক্ষিতা, উন্নত হৃদয়া ও বিলাত ফেরত। স্যার তারকনাথ সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে রাখিয়া কন্যাকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পথে চলিতে দিয়াছিলেন। যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কন্যা এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী ব্যারীষ্টার-তনয়কে বিবাহ করিতে চাহিলে স্যার তারকনাথ সানন্দে সে বিবাহে সম্মতি দান করেন। সাড়ম্বরে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু প্রেমজ হইলেও লিলিয়ান্ এ বিবাহে সুখী হইতে পারিলেন

না—স্বামীব সহিত খিটিমিটী তাঁহার লাগিয়াই রহিল। স্বামীত্বের সুযোগ লইয়া স্ত্রীর উপবে যতটুকু প্রভাব খাটানো চলে, লিলিয়ানের স্বামী সেটুকু প্রভাব খাটাইতে চাহিতেন; কিন্তু ধনী পিতার আদরে বর্দ্ধিতা কন্যা স্বামীকে স্বামীত্বে ততখানি অধিকার প্রদান করিয়া আপনাব স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কবিবেন কেন? তিনি স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া আসিলেন।

দাম্পত্য-কলহ অনেক স্থলেই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ঘটাইলেও এ স্থলে তাহার ব্যাতিরেক দেখা গেল। কলিকাতা হাইকোর্টে প্রকাণ্ড এক বিবাহ-বিচ্ছেদেব মামলা দাযেব হইল। এই মামলাব লিলি-য়ানেব পক্ষ সমর্থন করিলেন লর্ড (তখন স্যার) এস্ পি সিংহ। তাঁহার স্বামীব পক্ষেও বড় বড় ব্যারীষ্টাব নিযুক্ত হইলেন। ডাইভোর্স মঞ্জুর হইল।

বাঙ্গালীর মধ্যে ইহাই বোধকরি ডাইভোর্সের প্রথম মামলা। এই কাবণে লিলিয়ানের নামটী আজও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এনা দেবী+আর-সি-রায়

শ্রীযুক্তা এনা দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বংশের কন্যা। কমিউনিষ্ট বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার ভ্রাতা। সৌম্যেন্দ্র নাথ কমিউনিষ্টগণের রীতি অনুসাবে কোন ধর্ম্মই মানেন না, কিন্তু এনা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শে অনু-প্রাণিত।

মিঃ আর সি রায়েব পূর্ব্ব-পুরুষগণ হিন্দু ছিলেন, জাতিতে তাঁহারা বৈদ্য। মিঃ রায়ের পিতা গোপাল রায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর সি রায়ও পিতারই মত পিতৃ-অবলম্বিত খৃষ্টধর্ম্ম বিশেষ আস্থাবান—তিনি যে খৃষ্টান-কন্যা বিবাহ না করিয়া ব্রাহ্ম-দুহিতা বিবাহ করিবেন, তাঁহার স্বজনবর্গ ইহা ভাবিতেও পারেন নাই।

এনা বিদুষী ও গুণবতী। তাঁহাব সহিত পরিচয় লাভে আব সি রায় মুগ্ধ হইলেন; এনাও তাঁহাব প্রতি অনুবাগিনী হইয়া পডিলেন। দু'জনে বিবাহ সম্বন্ধে পবামর্শ হইল—পবামর্শেব ফলে এই স্থির হইল যে ধর্ম্ম-গত বিভেদ জন্য তাঁহাবা পবস্পবকে পবস্পবেব নিকট হইতে বিভিন্ন কবিয়া বাখিবেন না; তবে বিবাহে আবদ্ধ হইয়াও নিজ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস বজায় বাখিবেন।

কার্য্যতঃ তাহাই হইতেছে। এনা ও আব সি বায পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইযা একত্রে ঘবকন্না কবিতেছেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস বিসর্জ্জন দেন নাই। দিল্লীব মোগল বাদ্‌শাদেব অন্তঃপুবেব ন্যায় এই পবিবারে দুটিই স্বতন্ত্র ধর্ম্ম অক্ষুন্ন ভাবেই নিজ প্রভাব বক্ষা কবিতেছে। এনার স্বামী গীর্জ্জায় গিয়া খৃষ্টোপাসনা কবেন আব এনা ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মোপাসনায যোগদান কবেন। এনার বাবো তেবো বৎসব বয়স্ক একটী পুত্র আছে, সে কিন্তু বলে—"খৃষ্টান বলিয়া পবিচয দিতে আমাব লজ্জা বোধ হয। বড হইযা আমি হিন্দু হইব"।

রমলা গুপ্তা+তুলসী গোস্বামী

অনাবেব্‌ল্ বমলা সিংহ বাযপুবেব বিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহেব কন্যা, বাংলাব অন্যতমশ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিজাত গৃহেব কন্যা বমলা যে আশৈশব পবম যত্নে, ঐশ্বর্য্যেব চবম বিলাসেব মধ্যেই প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাঁহাব সহিত তাঁহার বিবাহ হইযাছিল সেই মিঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও অভিজাত বংশেবই সন্তান—তাহাব উপবে তিনি নিজে উচ্চশিক্ষিত, কলিকাতাব ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যেব দ্বিতীয মহানগবীব মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটেব অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন (সুতবাং পরম শান্তিতে বিবাহিত জীবন যাপনেব পক্ষে বমলার কোন বাধা ছিল না। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলের গৌববে গৌরবান্বিত হইয়া তিনি

ভারত মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ খ্যাতি ও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শ্রীরামপুরের জমীদার স্বর্গীয় কিশোরীমোহন গোস্বামীর উচ্চশিক্ষিত পুত্র বাংলার স্বরাজী কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামী ঐশ্বর্য্যের তবকে মোড়া প্রেমোপচার লইয়া রমলার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রমলা সানন্দে তাঁহার সে প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করিলেন এবং পিতার অতুলনীয় বংশ গৌরব ও স্বামীর প্রেম-মাধুরী-মণ্ডিত সুখের সংসার, উভয়কেই হেলায় পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাগরের সঙ্গে ব্যাভিচার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন।

রমলার পক্ষে যেমন চরিত্র ও বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবনকে সুখময় করিয়া তোলা সম্ভবপর ছিল, তুলসীচরণের পক্ষেও তাহাই। তিনি স্বনামধন্য পিতার পুত্র—নিজেও কংগ্রেস এবং ব্যবস্থাপরিষদ্ উভয়ের সাহায্যে অপরিমিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বিবাহও করিয়াছিলেস বাংলার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বনিয়াদী বংশে, ময়মন্‌সিংহের স্বনামখ্যাত জমিদার কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের কন্যা। পিতৃকুল হিসাবে তাঁহার এই পত্নী আভিজাত্য বংশ-গৌরবে, অর্থবলে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় লর্ড সিংহের কন্যা অপেক্ষা কোন অংশেই নিম্নে নহে। একাকী বিলাত ভ্রমণ, বিলাতী নাইট্‌ক্লাব ও বল-নাচের পার্টীতে যোগদান, অন্য পুরুষের সহিত বিমান-ভ্রমণ ও Joy riding বা অশ্বারোহণ প্রভৃতিততে অভ্যস্তা না হইলেও তিনিও উচ্চশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচিসম্পন্না। তাহা ছাড়া তিনি পরমা সুন্দরী—যেরূপ সুন্দরী ক্বচিৎ দেখা যায়। হাঁটু অবধি ওঠা স্কার্ট পরিয়া বিশজন পুরুষের সহিত ডিনার পার্টিতে পেগ্ গ্রহণে তিনি সিংহ দুহিতার নিকট হার মানিতেন—অন্যথা মনুষ্যোচিত যাবতীয় গুণে রমলা তাঁহার পদতলে বসিবারও যোগ্যা নহেন। তথাপি যে হতভাগ্য কাঞ্চন ফেলে কাঁচ আঁচলে বাঁধিতে যায়, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে?

যাহা হৌক তুলসীচরণ রমলার সহিত ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—আদালতের বিবরণে প্রকাশ, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া রমলাকে মুগ্ধ করিলেন। রমলার স্বামী নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং আদালতে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, তাঁহাকে আপিসে পৌঁছাইয়া দিবার ভাণ করিয়া রমলা প্রতিদিন তাঁহার সহিত বাহির হইতেন এবং আপিসে পৌঁছাইয়া দিয়া সেই গাড়ী লইয়া সটান গোস্বামীদের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। গোস্বামীর বহুমূল্য "রোল্‌স্ রয়েস্" গাড়ীখানি রমলার এত ভাল লাগিত যে তুলসীচরণকে তিনি আদর করিয়া "রোলস্ রয়েস্" বলিয়া ডাকিতেন। এই রোল্‌স্ রয়েসে আরোহণের মোহই নাকি তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

নগেন্দ্রনাথ যখন ব্যাপারটী সম্যক অবগত হইলেন তখন আর প্রতি-নিবৃত্ত করিবার সময় ছিল না। তথাপি তিনি একদিন স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলেন—স্ত্রীও স্বামী-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে তুলসীচরণ রমলাকে লইয়া প্রথমে কাশ্মীর প্রভৃতি ভার-তের কয়েকটী স্থানে ও পরে ইউরোপে বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করেন। আদালতের মামলায় প্রকাশ, রমলা সহ তুলসীচরণ প্যারী, বার্লিন, ভিয়েনা, মিউনিক্, লণ্ডন ও ইউরোপের অন্যান্য বড় বড় সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল সমূহে অবস্থান করিয়া কালাতিপাত করেন।

প্রণয়ী-যুগল ভারতে ফিরিয়া আসিলে মিঃ গুপ্ত হাইকোর্টে (১) স্বীয় পত্নীর সহিত ব্যাভিচারের অভিযোগে শ্রীযুত গোস্বামীর বিরুদ্ধে দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের (২) বিবাহ-বিচ্ছেদের ও (৩) দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র অনিলকুমারকে নিজের কাছে পাঠাইবার দাবী দিয়া এক মামলা আনয়ন করেন। হাইকোর্ট তাঁহার তিনটী দাবীই মঞ্জুর করেন—কেবল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দেড় লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে চৌষট্টি হাজার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে অনারেব্‌ল্ রমলা সিংহ কিছুকাল ভ্রাতাদের সঙ্গে বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীযুত তুলসীচরণ গোস্বামীর সহিত বিবাহিত হইয়াছেন—সম্প্রতি মিসেস্ রমলা গোস্বামী ও মিঃ তুলসীচরণ গোস্বামী স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করিতেছেন।